

ঋতু পরিবর্তন পর্যায়ে  
স্বাস্থ্য রক্ষায় সঠিক পথ্য  
— পৃঃ ১৯

দাম : যোলো টাকা

# স্বস্তিকা

ঋতু পরিবর্তনের সময়  
যোগানুশীলনের সুফল  
— পৃঃ ২৩

৭৮ বর্ষ, ২৬ সংখ্যা।। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।। ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২।। যুগান্দ - ৫১২৭।। website : [www.eswastika.com](http://www.eswastika.com)



# কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে  
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

# স্বস্তিকা

॥ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ॥

৭৮ বর্ষ ২৬ সংখ্যা, ১০ ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২৩ ফেব্রুয়ারি - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

# সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় □ ৫
- রাক্ষস রাজত্বে চৌর্যভাতা ও চৌর্যকর্ম চলছে সমান দরে
- 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬
- দুখেল গাইয়ের দুখে জল □ সুন্দর মৌলিক □ ৭
- দিক নির্দেশক বৌদ্ধিক নেতৃত্ব □ অমোল পেডগেকর □ ৮
- ডোল অর্থনীতির জাল ছিঁড়ে পশ্চিমবঙ্গকে বেরিয়ে আসতেই হবে □ কৌটিল্য □ ১০
- আরজি কর থেকে ডিএ, ফাইল কাণ্ড— সুপ্রিম কোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির অদৃশ্য ইকোসিস্টেম □ সাধন কুমার পাল □ ১১
- নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের অনাস্থা প্রকট হয় □ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ১৩
- বাংলাদেশে জেহাদিতন্ত্রের উত্থান দেশটিকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে □ সোমনাথ গোস্বামী □ ১৫
- ত্বককে বসন্তকালে ঠিক রাখতে প্রচুর জল পান করতে হবে □ ডাঃ ইমরান ওয়ালি □ ১৭
- শীত থেকে বসন্ত : খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন □ দিতি ভট্টাচার্য □ ১৮
- শীতের প্রস্থান ও বসন্তের আগমনের মধ্যবর্তী ঋতু পরিবর্তন পর্যায়ে স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজন সঠিক পথ্য □ ত্রিয়া সিংহ □ ১৯
- বসন্তকালে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে কয়েকটি নিয়ম পালন করলেই হবে □ ডাঃ সুশান্ত মিত্র □ ২০
- ঋতু পরিবর্তনের সময় যোগানুশীলনের সুফল □ ভাস্কর গোস্বামী □ ২৩
- স্বামীজীর আলোকে নেতাজীর রাষ্ট্র ভাবনা □ সন্দীপ কুমার সিনহা □ ৩১
- মানবোন্নতির চেতনাগত যাত্রা—কর্ম থেকে ব্রহ্মবোধ □ অনামিক রায় □ ৩৪
- ঋতুসন্ধিকালে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা রক্ষায় নিমপাতা, আমলকি ও সজনে ডাঁটা □ অধ্যাপক (ডাঃ) দেবাশিস পাহাড়ী □ ৩৬
- বসন্তকালে ছোটোদের চোখের সংক্রমণ রুখতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি □ ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত □ ৩৭
- ঋতু পরিবর্তনকালীন পর্যায়ে সুস্থ থাকার উপায় বসন্তচর্যা □ ডাঃ নৃপুর বিশ্বাস □ ৩৯
- বৈষ্ণব সাহিত্য : ঋতুবৈচিত্র্যের মালঞ্চ □ ড. কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. মনাজলি বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৪৩
- খিলাফত আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না □ ড. অমলেশ মিশ্র □ ৪৬
- সঞ্জের আহ্বানে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে সমগ্র বিশ্ব আবার ভাঁওতার ভাতা—বেকার ভাতা চায় না, রোজগারের ভাতা চায় □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ৪৯
- আবার ভাঁওতার ভাতা—বেকার ভাতা চায় না, রোজগারের ভাতা □ ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত □ ৩৭
- গল্প রুথায় ডাক্তারজী □ বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০
- নিয়মিত বিভাগ : □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ □ খেলা : ৩৯ □ নবাকুর : ৪০-৪১ □



# স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ



## দোল সাহিত্য সংখ্যা

বঙ্গজীবনে দোল, হোলি বা দোলযাত্রা বসন্তের আগমনীবার্তা বয়ে আনে। এই শুভদিনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে এই সময়ে বসন্ত উৎসবের সূচনা করেছিলেন।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় দোল উপলক্ষ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের গল্প, ছোট গল্প প্রকাশিত হবে।

### বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার  
প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে,  
তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত  
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে NEFT-র মাধ্যমে  
সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের  
শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে QR code ছাপানো  
হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে  
পারেন।



টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই  
জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :  
**SUBHSWASTIKA PRINTS  
FOUNDATION**

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

**INDIAN OVERSEAS BANK**

Branch : **Sreemani Market**

**Kolkata-700 006**

### বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা  
করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০ টাকা  
(মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক  
তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা)  
পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

### একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২  
সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের  
কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য  
হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)  
টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের  
কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি  
ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম :-

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints  
Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন।  
টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার  
সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা  
নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

## সম্পাদকীয়

### শীত উপভোগ করিলেও বসন্তে সাবধানতা

ঋতুচক্রের আবর্তনে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ ভারতে এক সময় শীত আসে। শহরে ও গ্রামগঞ্জের মানুষেরা তা উপভোগ করেন। অন্যান্য ঋতুর ন্যায় কবি-সাহিত্যিকগণ কবিতা-কাব্য-সাহিত্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক কবি-সাহিত্যিকগণও নানাভাবে তার বর্ণনা করিয়াছেন। বাঙ্গালির নিকট শীতকাল মানেই নূতন ধান, নূতন গুড়, পিঠেপুলি, কত খাদ্যসম্ভার। দিকে দিকে বনভোজনের ধুম। এই সবে মধ্য প্রায় সকলেই ভুলিয়া যান এই সময় তাঁদের চারিপার্শ্বের বাতাস প্রাকৃতিক কারণেই দূষণে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। শীতের মহিমা কীর্তন এবং শীতকাল উপভোগ করিতে করিতে মানুষের মনেই পড়ে না এই সময় পরিপার্শ্বের তাপমাত্রা নিম্নমুখী এবং বাতাসের গতি মন্থর হইবার কারণে বায়ুস্তর স্থিত হইয়া পড়ে এবং তাহার কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। শীতকালে বাতাস এতটাই দূষিত হইয়া পড়ে যে, উত্তর ভারতের দিল্লি, লক্ষ্মী ও চণ্ডীগড়ের ন্যায় শহরগুলিতে কয়েক মিটার দূরের বস্তুও দৃশ্যমান থাকে না। চারিপার্শ্ব ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়িয়া যায়। বায়ুমানের সূচক চারি শতকও অতিক্রম করিয়া যায়। ইহার উপর রহিয়াছে ফসল কর্তনের পর কৃষিবর্জ্য দগ্ধ করিবার প্রবণতা। ইহার ফলে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া ও দূষিত কণা বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হইয়া পড়ে। শহর ও গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষ এই সময় কঠোর শীতের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কাঠ-খড়, কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানি দগ্ধ করিয়া থাকে। ইহার ফলেও বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কণা পদার্থ বা পার্টিকুলেট ম্যাটার বিশেষত সূক্ষ্ম কণিকা (পিএম ২.৫ মাইক্রন) এবং স্থূল কণিকা (পিএম ১০ মাইক্রন)-র ঘনত্ব ও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সকল কারণের জন্য অন্য ঋতুর তুলনায় শীতকালে বায়ুদূষণের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতা শহরে বাতাসের মান (AQI) ছিল তিনশতের নিকটে। পরিবেশবিদদের মতে যাহা 'বিপজ্জনক' পর্যায়ের অন্তর্গত। শীতের আমেজ অনুভব করিতে করিতে বহু সচেতন মানুষও ইহার কুফলগুলি একেবারে ভুলিয়া যান।

কিন্তু বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্তের আগমনে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে মানুষ এই সময় নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ের রোগ-ব্যাধি সাময়িক হইলেও খুবই অস্বস্তিকর হইয়া থাকে। সময় মতো সাবধানতা অবলম্বন করিতে না পারিলে জীবনহানিও ঘটিতে পারে। এই সময় আবহাওয়া উষ্ণ ও শুষ্ক হইবার কারণে জলবসন্ত, হাম, সর্দি-কাশি-হাঁপানি, অ্যালার্জি এবং ভাইরাসজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পরিবর্তিত আবহাওয়ায় যত শীঘ্র চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সাবধানতা অবলম্বন করা যায় ততই মঙ্গল। আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক অথবা আসন-প্রাণায়ামাদি, যাহার পক্ষে যাহা উপযোগী সেই পদ্ধতিতেই উপকার মিলিবে। যে কোনো চিকিৎসা পদ্ধতিরই লক্ষ্য হইল মানুষকে সুস্থ রাখা। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে বিগত কয়েক বৎসর হইতে স্বস্তিকা পত্রিকায় বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত পরামর্শ প্রকাশিত হইতেছে। স্বস্তিকার পাঠকদের সহিত সাধারণ মানুষও যে ইহাতে উপকৃত হইতেছেন, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

### সুভাষিতম্

নাভিষেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে মৃগৈঃ।

বিক্রমার্জিতরাজ্যস্য স্বয়মেব মৃগেন্দ্রতাম্।।

অর্থঃ কোনো অভিষেক, কোনো সংস্কার ছাড়াই কেবলমাত্র নিজের বিক্রমের দ্বারা সিংহ নিজেই পশুরাজ পদ প্রাপ্ত করে।

# রাক্ষস রাজত্বে চৌর্যভাতা ও চৌর্যকর্ম চলছে সমান দরে 'ভবতি ভিক্ষাং দেহি'

## নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

এসআইআর-এর গুঁতোয় এ রাজ্যের প্রায় নয় থেকে দশ শতাংশ ভুয়ো ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে পরম্পরাগতভাবে এই ভুয়ো ভোটারদের ভোট হলো শাসক দলের সম্পদ। প্রাপ্ত ভোট নয় শতাংশ কমে যাওয়ায় ২০১১ সালে বিদেশি বামেরা হেরে যায়। আসন্ন ভোটে রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসও তার ব্যতিক্রম হবে না। অনেক সময় 'ক্যাম্প ডেভিড' কথাটি গোপনে সরে আসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রাজ্যের ২৯৪টি কেন্দ্রে ভাতা ক্যাম্প চালু করেছে তৃণমূল। মুক-বধির অমাত্য আর মতহীন অর্থমন্ত্রী গাভী সদৃশ হয়। সেকুলার নেতারা পচনশীল বস্তু। পচে যাওয়া হাত আর অক্ষম রাজাকে নির্বাসন দেওয়াই উচিত। ভারতীয় শিক্ষাক্রমের অংশ হিসেবে 'ভিক্ষা'র যে শাস্ত্রীয় ব্যঞ্জনা রয়েছে, এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার তার বিকৃতি ঘটিয়েছে। শাসক নিজেই ভিখারি সেজে গিয়েছে। ভাতার প্রলোভন দেখিয়ে ভোট ভিক্ষা করছে। ভাতার ভাঁওতা হলো ভোটার ঠকানোর কৌশল। একধরনের নিশাচরী চৌর্যবৃত্তি। ভাঁড়ার শূন্য রাজাকে কাকপক্ষীও পরিত্যাগ করে। ভোটারকে বুঝতে হবে চৌর্যভাতা ঘোষণা করে দেওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ভাতা হলো ভাত বন্ধের কৌশল। তাই আওয়ান ভিক্ষাপাত্রের টোকরি রাজ্যের ভোটারদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত। বিদেশি বাম আমলে রাজ্যের অধিকাংশ শিল্পাঞ্চল শ্বশানে পরিণত হওয়ায় রাজ্যে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ধস নামে। চাকরি দিতে না পেরে একসময় বিদেশি বামেরা বেকার ভাতা চালু করেছিল। বর্তমান তঞ্চকের সরকার তা 'যুবসার্থী' নামে চালু করেছে। এটি একধরনের 'লুস্পেন ভাতা'। তৃণমূলের তিন ধরনের ভোটারদের মধ্যে মুসলমান আর রাজ্যের মহিলাদের একাংশের পাশাপাশি 'লাল চুল কানে দুলা' লুস্পেন বাহিনীও রয়েছে। 'রাজ্যপাট'-এর কলমেই ইতিপূর্বে উল্লেখিত

হয়েছে যে, তিনটি ক্ষেত্রেই এবার তৃণমূলের ভোট সরবে ব্যাপক হারে।

পাশের প্রতিবেশী বাংলাদেশে নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর সরকারি ক্ষমতায় মোল্লাবাদীদের সরাসরি দাপট আপাতত সামান্য কমেছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই মোল্লাবাদকেই তোলা দিচ্ছে তৃণমূল সরকার। তবে জেহাদি মোল্লারা পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের পাঁচটি জেলা— সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর ও গাইবান্ধায় নির্বাচন জিতেছে। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি জেলা— উত্তর ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার হয়ে উঠেছে অতি স্পর্শকাতর। বাংলাদেশ জুড়ে ৭৮টি আসনে মোল্লাবাদী জামাত দলের জয় পশ্চিমবঙ্গের জন্য আদৌ সুখকর বিষয় নয়। তাই আসন্ন ভোটে হিন্দু ঐক্যকে আরও বৃহৎভাবে প্রদর্শিত হতে হবে। জেলাস্তরে হিন্দুদের আরও ব্যাপকভাবে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তৃণমূলের শিরে সংক্রান্তি। দলের ভিতর সুবিধাভোগী শ্রেণী বা বেনিফিশিয়ারি ক্লাস একদিকে, আর তার বিপরীতে রয়েছে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা হতে বঞ্চিত দলীয় সমর্থককুল। এইভাবে কার্যত দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তা নিয়ে দু'দলে চুলোচুলি শুরু হয়েছে। দলের শেষ বেলায় সমর্থকরা লুঠের বখরা চাইছে। তারা এই বখরার বড়ো ভাগ চাইছে আর লুঠেরা সুবিধাভোগীরা তা ছাড়তে নারাজ। শোনা যাচ্ছে যে, লুটে আনা সম্পদের বখরার ৯০ শতাংশ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে দলীয় সুবিধাভোগীরা আর একটা বড়ো অংশের সমর্থক লুঠের মালের অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকছে। এই সমর্থকদের গুন্ডাগার্দীর জোরেই তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে। এই বখরার ভাগাভাগি আগেই ৭৫ শতাংশ ও ২৫ শতাংশ করে দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী। ঘুরিয়ে বলেছিলেন চুরির ঢাকার ২৫ শতাংশ নীচুতলার চোর-লুঠেরারা রাখুক আর বাকি ৭৫

শতাংশ দলকে দিক। তা হয়নি। সুবিধাভোগীরা ৭৫ শতাংশ বা তার বেশি নিজেরা রেখে ২৫ শতাংশ বা তারও কম দলকে দিয়েছে। সেই ২৫ শতাংশের ভাগ নিয়ে এখন এই দলীয় সমর্থকরা কামড়াকামড়ি করছে।

তৃণমূলের ৪৫ শতাংশ ভোটের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সমর্থক আর বাকিটা দলের সুবিধাভোগী শ্রেণী। এই অতি-তৃণমূলি, বিরাট সমর্থকের দল শেষ বেলায় তাদের ভাগের বখরা চাইছে। ফলে তৃণমূলের ভোটব্যংক যে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে তা সহজেই বলা যায়। ২০১১-তে বামদের ভোট সরেছিল ৯ শতাংশ। তৃণমূলের ক্ষেত্রে তা দ্বিগুণ হতে পারে। পুরোদস্তুর রাজনৈতিক দল না হওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই অসংগঠিত সন্ত্রাসের যে বখরা এই ধরনের ছোটো দলেরা তুলে থাকে, তৃণমূলে এখন তাই চলছে। তারা গজিয়ে ওঠা, ডুইফোঁড় পাড়ার ক্লাবের মতো। শাসনের শেষ বেলায় ঠিক যেমন ঘটেছিল বিদেশি সিপিএমের সঙ্গে, অনেকটা তেমনই কিছু এবার ঘটতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে। অনেকেই বলা শুরু করেছেন যে, তৃণমূলের বিদায় আসন্ন। তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ভোট যত এগোচ্ছে, তা জোরদার হচ্ছে। তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে বাজেয়াপ্ত করা ফাইল ছিনতাই করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। হাস্যকরভাবে দাবি করেছেন যে, ইডি-র অনুমতি নিয়েই তিনি নাকি এ কাজ করেছেন। অথচ ইডি তার বিরুদ্ধে চুরি আর ডাকাতির মামলা করেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৭টি ধারায়। চৌর্যবৃত্তি বড়ো কাজ, যদি না পড়ে ধরা। বামাল ধরা পড়েছেন তৃণমূলনেত্রী। তাই রাজ্যের ভোটারদের সামনে ভাতার ঝুলি ঝুলিয়ে ভোট ভিক্ষা কি আর কাজে দেবে? তৃণমূল যাচ্ছে ভোটারের দরজায় 'ভিক্ষাং দেহি' বলে। সে ভিখারি রাবণের মতো সাধুবশে তক্ষর। তাই রাজ্যের সাধু ভোটারদের সাবধান থাকতে হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

# দুধেল গাইয়ের দুধে জল

দুধেল গাইপ্রিয়েরু দিদি,

ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই দুশ্চিন্তা বাড়ছে। নির্বাচন কমিশন মরা মানুষগুলোকে সতাই মেরে দিল। এতদিন তবুও ভোটের তালিকায় তো বেঁচেছিল। ভুয়ো, নিখোঁজ, জালি ভোটেররা এখন কোথায় কে জানে! ওদের স্থায়ী ঠিকানা তো ভোটের তালিকায় ছিল দিদি। আপনি কতো যত্নে রেখেছিলেন। আজ তারা নেই, কেউ নেই, কোথাও নেই। আপনি যে চিন্তায় আছেন জানি, আপনার একান্ত অনুগত এই ভাইটারও দিদি রাতে ঘুম হচ্ছে না। ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়, আর আমি রোজ ভোরেরই স্বপ্ন দেখছি, ভোট মিটে গেছে, নবাবের চোদ্দ তলাটা ফাকা, আর কালীঘাটের বাড়ির দরজাটাও ভেতর থেকে বন্ধ। কড়া নাড়তে যাব, আতঙ্কে ঘুমটা ভেঙে যায়।

এই যে ভয়, সেটা শুধু এসআইআর নিয়ে নয়, আপনি যাদের লাখি খেতে ভালোবাসেন, সেই দুধেল গাইদের নিয়ে ভয়। গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্যের মুসলমান ভোট আপনার দিকেই। কিন্তু এটাই প্রথম নির্বাচন, যেখানে আপনার দল তৃণমূলের সামনে মুসলমান ভোট ভাগ হওয়ার নানা উপসর্গ তৈরি হয়েছে।

প্রথমটা হলো, ২০২১ সালের ভোটের আগে আব্বাস সিদ্দিকি এবং নওশাদ সিদ্দিকিদের আইএসএফ ছিল সদ্য গজিয়ে ওঠা দল। সেই আইএসএফ গত পাঁচ বছর ধরে রাজনৈতিক ভাবে অভিজ্ঞতা বাড়িয়েছে। আব্বাস রাজনৈতিক পরিসর থেকে দূরে থাকলেও তাঁর ‘ভাইজান’ নওশাদ ‘নেতা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। মজহবের কথা তো

আছেই, সেই সঙ্গে সংখ্যালঘু, দলিত, জনজাতিদের অধিকারের কর্মসূচিটি সামনে রেখে রাজনীতি করেছেন নওশাদ। শেষ মুহুর্তে নাটকীয় কোনো মোচড় না হলেও নওশাদেরা এবারের ভোটেও সিপিএমের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে লড়বে বলে শুনছি।

দ্বিতীয় কারণ হুমায়ুন কবীর। তাঁর দল জনতা উন্নয়ন পার্টি নতুন হলেও তিনি পুরনো। তিনি ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছেন বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করে। সেই হুমায়ুন খোলাখুলিই মুসলমানদের তৃণমূল থেকে দূরে রাখার বার্তা দিচ্ছেন। তৃণমূলের অনেকের আশঙ্কা, হুমায়ুন নিজে বা তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত দল ক’টা আসন জিতবে, সেটা ভাবার মতো বিষয় নয়। কিন্তু তিনি মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু আসনে ভোট

**তৃণমূলের অনেকের  
আশঙ্কা, হুমায়ুন নিজে  
বা তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত  
দল ক’টা আসন জিতবে,  
সেটা ভাবার মতো  
বিষয় নয়। কিন্তু তিনি  
মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু  
আসনে ভোট কেটে  
নিয়ে তৃণমূলের যাত্রা  
ভঙ্গ করতে চাইবেন।  
এটাই আশঙ্কার বিষয়।**

কেটে নিয়ে তৃণমূলের যাত্রা ভঙ্গ করতে চাইবেন বলে আশঙ্কা করছেন আপনার দলের অনেকে।

তৃতীয় কারণটা এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের ভোটের জন্য জেলা এবং আসন নির্দিষ্ট করে গত কয়েক মাস ধরে কাজকর্ম শুরু করেছে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দল ‘মিম’। যে দল আবার জোট বেঁধেছে হুমায়ুনের দলের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর লাগোয়া বিহারের কিষাণগঞ্জে ‘মিম’ ভালো ফল করেছে দু’মাস আগের ভোটে। ওই করিডোর দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে চাইছে তারা। ডালপালা মেলতে চাইছে মালদহ ও মুর্শিদাবাদেও। চিন্তার কিনা বলুন দিদি!

আরও একটা কারণ আছে— মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে। ঘটনাচক্রে, গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদহ ও মুর্শিদাবাদে সবচেয়ে ভালো ফল করেছিল তৃণমূল। এই দুই জেলাতেই ভোট ভাগের সমীকরণ তৈরি হচ্ছে। এ-ও বাস্তব যে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী রাজনীতিতে বাম-কংগ্রেস প্রাস্তিক শক্তিতে পরিণত হলেও মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরে তাদের জনভিত্তি এখনও রয়েছে। ভোটও রয়েছে। গত লোকসভা ভোটেও তা স্পষ্ট হয়েছে। বাম-কংগ্রেসের দিকে যে ভোট রয়েছে, তারও মূল ভিত্তি মুসলমান অংশই। এবার বাম-কংগ্রেসের জোট নেই, মৌসম বেনজির নুরের মতো গনিখান চৌধুরীর পরিবারের মুখ তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে গিয়েছেন— ইত্যদি নানা সমীকরণও আছে। ফলে মুসলমান ভোট পুরোপুরি আপনার দিকে না যাওয়ার পরিস্থিতি স্পষ্ট।

এখানেই ভয়, আর ওই সেই ভয়েই আমার দুঃস্বপ্ন দেখা। সত্যি হবে না তো দিদি! □



অমোল পেডণেকর

ভারত আজ যে সময়ের মধ্যে দিয়ে চলছে তা সাধারণ কোনো ঐতিহাসিক পরিবর্তন নয়। এটি এমন এক সময় যখন একটি দেশ তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পর মানসিক, সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতাকে পুনঃ পরিভাষিত করছে। ক্ষমতার পরিবর্তন, অর্থনৈতিক সংস্কার ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এই প্রক্রিয়ার বাহ্যিক দিক, কিন্তু আরও গভীর স্তরে ভারত একটি প্রশ্নের সঙ্গে লড়াই করছে — আমরা কে? আমরা কোথায় যাব? এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা কেমন ভারত রেখে যেতে চাই? এই প্রশ্নপটে আজ যে বৌদ্ধিক নেতৃত্বের চর্চা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে তা হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরস্বচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের। এই নেতৃত্ব কোনো সাংবিধানিক পদ নয়, মিডিয়া-সৃষ্ট প্রতিচ্ছবির পরিণামও নয়। এই উত্থান মতাদর্শগত ধারাবাহিকতা, জাতির সম্মান ও স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্টতা এবং সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পথনির্দেশের স্বাভাবিক পরিণাম।

বর্তমান পরিদৃশ্যে নেতৃত্বকে প্রায়শই রাজনৈতিক ক্ষমতা, প্রভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাৎক্ষণিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখা হয়। তবে ভারতীয় চিন্তন পরম্পরায় নেতৃত্বের অর্থ এর থেকে অনেক ব্যাপক ও গভীর। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একজন নেতা তিনিই যিনি কেবল আদেশ জারি করেন না, বরং যিনি সমগ্র সমাজকে তার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারেন, সেটাই সত্যিকারের নেতৃত্ব। এটি বর্তমান সংকট কাটিয়ে ওঠার এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি মূল্যবোধভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গি। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিচার করলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ডাঃ মোহনরাও

## দিক নির্দেশক বৌদ্ধিক নেতৃত্ব

ভাগবতের বহুমুখী নেতৃত্ব আজকের রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই নেতৃত্ব রাজনৈতিক ক্ষমতা-কেন্দ্রিক নয়, সম্পূর্ণভাবে জাতীর চেতনা উদ্রেককারী।

বৌদ্ধিক নেতৃত্ব এমন এক নেতৃত্ব যা তাৎকালিক প্রশংসা নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনের মানসিকতা সৃষ্টি করে। ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের বক্তৃতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো তিনি তাঁর ভাষণে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন না; মানুষের বিবেককে জাগ্রত করেন। তিনি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর খুব চিন্তাভাবনা করে দেন, স্লোগান দিয়ে নয়। তার ভাষার মধ্যে কোনো কটুতা নেই, নেই কোনো কৃত্রিমতা। তিনি এমন আন্তরিক ভাষা প্রয়োগ করেন যা সমাজমনে প্রেরণা সৃষ্টি করে। এই কারণেই তাঁর বক্তব্য কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করে না, গভীর বিমর্শের বিষয় হয়ে ওঠে।

যদি ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের গত এক দশকের বৌদ্ধিক ভাষণগুলি সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করা যায়, তাতে তিন স্তরের পথনির্দেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি প্রথম জোর দেন ব্যক্তিগত আচরণের ওপর। তিনি বারবার জোর দিয়ে বলেন যে, রাষ্ট্র নির্মাণ রাজনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে নয়, বরং মূল্যবোধ দিয়ে শুরু হয়। তাঁর মতে, শৃঙ্খলা, সংযম, কর্তব্যবোধ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধই রাষ্ট্রনির্মাণের মৌলিক নীতি। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভোগবাদী ও অধিকার-কেন্দ্রিক আধুনিক বিমর্শ থেকে একেবারে আলাদা। তাঁর দিকনির্দেশের দ্বিতীয় স্তরের প্রধান লক্ষ্য হলো সমাজ পরিকাঠামোর এপর। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন, ভারতের শক্তির তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত। কিন্তু এই বৈচিত্র্য সংঘাত নয়, সমন্বয়ের দ্বারা চালিত। জাতি, ভাষা, সম্প্রদায় ও প্রাদেশিকতার নাম করে বিচ্ছিন্নতার প্রসঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। অস্মিতাবোধ প্রয়োজন, কিন্তু সেই অস্মিতা যদি শ্রেষ্ঠত্বে পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে। এই সমরসতাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তাঁর নেতৃত্ব প্রতিযোগিতাপূর্ণ রাজনীতির উর্ধ্ব স্থান

পেয়েছে। তাঁর তৃতীয় স্তর দেশ ও জাতির সীমানা অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে বিস্তৃত হয়েছে। তিনি ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে দেখেন, বরং একটি পথপ্রদর্শক সভ্যতা হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি ‘বসুধৈব কুটুম্বকম্’ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বব্যাপী সমস্যার সমাধানের রাস্তা ভারতের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতকে উপদেশপ্রদানকারী বা আত্মকেন্দ্রিক করে না, এটি ভারতকে বৈশ্বিক ভারসাম্যকারী হিসেবে উপস্থাপন করে।

ভারত বর্তমানে শুধু এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে না, বরং নিজের সংস্কৃতিগত চেতনার পুনর্জাগরণ করে এক নির্ণায়ক পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। শ্রীরামমন্দির পুনরুদ্ধার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পর্যন্ত এই কালখণ্ড ভারতের সামাজিক মানসকে এক নতুন দিশা নির্দেশ করছে। এই সম্পূর্ণ বৈচারিক পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূজনীয় সরস্বচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের বৌদ্ধিক নেতৃত্ব। তাঁর ভাষণ শুধুমাত্র কথা নয়, বরং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য এক আদর্শগত কাঠোমো প্রস্তুত করে।

অনেকেই শ্রীরামমন্দির আন্দোলনের সফলতাকে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিজয় হিসেবে দেখেন, কিন্তু ডাঃ মোহনরাও ভাগবত এই বিজয়কে সংযম ও সামাজিক পরিপকতার কষ্টিপাথরে রূপান্তরিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট কথায় বলেছেন, শ্রীরামমন্দির সংগ্রামের সমাপ্তি হলো দায়িত্ববোধের আরম্ভ। এখন কারও জয় বা পরাজয়ের উন্মাদনায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়, বরং সমাজকে এক্যবদ্ধ করার সময়। তাঁর এই বক্তব্য হিন্দু সমাজকে আত্মনিরীক্ষণের জন্য উৎসাহিত করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রামের পর অর্জিত এই মুহূর্তটি যদি অহংকারে পর্যবসিত হয়ে যায়, তবে তা হবে ভারতাত্মার বিরুদ্ধে। এরকম এক ঐতিহাসিক ও নির্ণায়ক সন্ধিক্ষণে ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের বৌদ্ধিক এজন্যই অনন্য যে, তিনি

এই বিজয়কেও ভারতের শাস্ত্র সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে একীভূত করার কথা বলেন।

বর্তমানে বিরোধী বিমর্শে হিন্দুত্বকে ভয়ের বিষয় অথবা চরমপন্থায় পরিণত করা হয়েছে। ডাঃ মোহনরাও ভাগবত এই কৃত্রিম দ্বন্দ্বকে ভেঙে দিয়ে হিন্দুত্বকে তার প্রকৃত রূপে উপস্থাপন করেছেন, যা সকলের গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। তা বৈচিত্র্যকে দুর্বলতা নয়, শক্তি বলে মনে করে। যা আত্মরক্ষার শিক্ষা দেয়, কিন্তু আত্মসন নয়। তাঁর পরিষ্কার কথা যে, কারও বিরোধিতা না করে হিন্দুসমাজকে শক্তিশালী করতে হবে, যা বর্তমান ভারতে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বর্তমানে ভারতের যুবপ্রজন্ম প্রাণশক্তিতে ভরপুর, কিন্তু পথনির্দেশের অভাবে তারা বিভ্রান্ত। একদিকে বিশ্বব্যাপী সুযোগ, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাতছানি। ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের বৌদ্ধিক প্রভাবে যুব প্রজন্মের মনে আত্মগৌরবের পুনঃস্থাপন, রাষ্ট্রীয়তার ইতিবাচক পরিভাষা এবং জীবনকে একটি মিশনে পরিণত করার আহ্বান— এই তিনস্তরেই তাদের আকর্ষণ করেছে।

যুব সমাজের কাছে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, ভারতীয় হওয়া, হিন্দু হওয়া পশ্চাদ্গামিতা নয়, তা বিশ্ব মানবতাকে পথপ্রদর্শন করে এমন একটি ঐতিহ্যের অংশীদার হওয়া। এই রাষ্ট্রবোধ উগ্রতা বা প্রতিক্রিয়াশীলতা নয়। এই রাষ্ট্রবোধ সেবা, অনুশাসন ও সামাজিক দায়িত্ববোধের সঙ্গে যুক্ত। সঙ্ঘের কাজ যুবকদের কেরিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের সমন্বয় সাধন করতে শেখায়। এই কারণেই আজ বিপুল সংখ্যায় শিক্ষিত, প্রযুক্তিগ্ঞানে ভরপুর এবং পেশাদার যুবক সঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন।

হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো এক দীর্ঘ সময় তার অসংগঠিত থাকা। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর বৌদ্ধিকে হাসিঠাট্টার ছলে এইসব দুর্বলতা স্বীকার করেও তার সমাধানের পথ দেখান। জাতিগত বিভেদ দূরীকরণের জন্য সামাজিক সমরসতার ওপর জোর দেন। মঠ, মন্দির এবং হিন্দু পরম্পরাগুলিকে সমাজ সেবার সঙ্গে যুক্ত করার কথা বলেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু জাগরণকে কেবল ভাবনাশ্রম আন্দোলন নয়, বরং তা সংগঠিত সামাজিক চেতনায় পরিবর্তিত করে।

সঙ্ঘের শতবর্ষে আত্মচিন্তন ও আত্মবিস্তারের অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রয়াস পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক তাঁর ভাষণগুলিতে করে চলেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বার্তালাপ করার সময় তিনি বলেন, সঙ্ঘের শতবর্ষ উৎসব পালনের জন্য নয়, বরং দায়িত্ব সম্প্রসারণের একটি সুযোগ। এই বার্তা তিনি বারবার দিচ্ছেন। তিনি স্বয়ংসেবকদের কাছে আশা করছেন যে, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের কাছে যাবেন কেবল প্রচারের জন্য নয়। তাঁরা সেবাকাজে ব্যাপৃত থাকবেন, লোক দেখানোর জন্য মঞ্চ নয়। তারা সমাজের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন কিন্তু বিতর্কে জড়াবেন না। সারা বিশ্বের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সরসঙ্ঘচালকের এইসব কথাবার্তায় প্রস্তুত দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে একটি নীরব কিন্তু প্রভাবী রাষ্ট্রনির্মাণ হিসেবে উপস্থাপন করে।

ডাঃ মোহনরাও ভাগবতের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি অসাধারণ, কারণ

ডাঃ মোহনরাওয়ের ভাষণগুলির ফলে আগামীদিনে জনমানসে আত্মগৌরবের ভাব জাগতে হোক, সমাজ শক্তিশালী ভারত গঠনে নিয়োজিত হোক এবং সেবার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হোক, তাহলেই ভবিষ্যতের ভারত কেবল একটি অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তিই হবে না বরং সভ্যতার অগ্রগামী পথপ্রদর্শনকারী দেশ হয়ে উঠবে।

তিনি সংস্কৃতিকে কেবল এক জাদুঘরে সীমাবদ্ধ রাখেন না। তাঁর কাছে সংস্কৃতির অর্থ হলো এক পরিবার ব্যবস্থা, স্ত্রীসম্মান এবং প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা বোধ। সংস্কৃতির অর্থ ‘স্ব’-বোধের জাগরণ এবং সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি ভারতকে শুধু বিকাশশীল নয়, উপরন্তু বিশ্বের পথপ্রদর্শক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সঙ্ঘের শতাব্দী বর্ষকে নিমিত্ত করে অতীত সাফল্যের আলোকে কাজের পথনির্দেশ করার সময় তিনি স্বয়ংসেবকদের সামনে স্বাধীনতার অমৃতকালের বিষয়টি উপস্থাপন করেন। অমৃতকালের তাঁর ‘বার্তা’ কেবলমাত্র স্বয়ংসেবকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভারতের সমস্ত নাগরিকের জন্য এক

‘সংকল্প’ বহন করে। তিনি বলেন যে, ‘উন্নত ভারত’ তৈরি করা কেবল সরকারের কাজ নয়, তাতে সমাজের অংশগ্রহণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সরকার অমৃতকালকে পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যানে পরিভাষিত করলেও তিনি তাকে রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য চরিত্রনির্মাণের সময়কাল হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি স্পষ্টভাবে জোর দিয়ে বলেন, যদি সমাজ পরিবর্তন না হয়, তবে কোনো নীতিই স্থায়ী হতে পারে না। ‘স্ব’-বোধের জাগরণ, নাগরিক শিষ্টাচার, পরিবার প্রবোধন, সামাজিক সমরসতা ও পরিবেশ সংরক্ষণ— এই বিষয়ে সমাজে যে উদাসীনতা রয়েছে তা দূর করার জন্য আমাদের নিজেদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্ররূপে পরিবর্তন সাধন করতে হবে। এবং এটিই ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। সরসঙ্ঘচালকজীর নেতৃত্বের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সাংগঠনিক অনুশাসন ও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠা।

সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের পদটি কোনো ব্যক্তিপূজার কেন্দ্র নয়। এই পদটি দায়িত্বপূর্ণ পরম্পরার বাহক। ডাঃ মোহনরাও ভাগবত এই পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সুনিশ্চিত করছেন যে, ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়ো, ব্যক্তির চেয়ে আদর্শ বড়ো এবং নেতৃত্ব যেন সেবাভাবের সমার্থক হয়। এই কারণেই আজ সঙ্ঘের আদর্শ, কাজ ও কথা সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে মান্যতা পেয়েছে।

অকারণ কোলাহলে সমগ্র বিশ্ব আজ ক্লান্ত। তাই তারা এমন নেতৃত্বের সন্ধান করছে, যা আবেগের অপব্যবহার করবে না, সমস্যাগুলিকে স্লোগানে পরিণত না করে ভবিষ্যতের জন্য একটি স্পষ্ট, ভারসাম্যযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। এই প্রেক্ষাপটে সরসঙ্ঘচালকজীর ভাষণগুলি সমগ্র বিশ্বের কাছে যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে। কারণ তাঁর কথাগুলি ক্ষণিকের জনপ্রিয়তা নয়, তা এক দীর্ঘমেয়াদি দিক নির্দেশনা করছে। ডাঃ মোহনরাওয়ের আজ পর্যন্ত ভাষণগুলির ফলে আগামীদিনে জনমানসে আত্মগৌরবের ভাব জাগতে হোক, সমাজ শক্তিশালী ভারত গঠনে নিয়োজিত হোক এবং সেবার মাধ্যমে তা প্রকাশিত হোক, তাহলেই ভবিষ্যতের ভারত কেবল একটি অর্থনৈতিক বা সামরিক শক্তিই হবে না বরং সভ্যতার অগ্রগামী পথপ্রদর্শনকারী দেশ হয়ে উঠবে। এবং সম্ভবত এটিই অমৃতকালের প্রকৃত অর্থ।

(লেখক হিন্দি বিবেক পত্রিকার সিইও)

## ডোল অর্থনীতির জাল ছিঁড়ে পশ্চিমবঙ্গকে বেরোতে হবে

সরকারি আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য না থাকায় প্রতিটি অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রচুর ঋণ নিতে হয়। কিন্তু এর বিপ্রতীপে রাজ্য সরকারের স্থায়ী সম্পদ কিছু তৈরি হয় না। রাজ্যে মূলধনী খাতে ব্যয় খুবই কম। মূলধনী ব্যয়বৃদ্ধি না হওয়ায় রাজ্যে কোনো নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প, স্মার্ট সিটি, কৃষক মান্ডি, উন্নত সড়ক, সেচ ব্যবস্থা, পানীয় জল প্রকল্প, নিকাশি ব্যবস্থা, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর ইত্যাদি রূপায়িত হয়নি বললেই চলে। সেখানে গত দেড় দশকে রাজ্যের ঋণ পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। ২০১১ সালে রাজ্য সরকারের দেনা ছিল প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৬-এ সেই দেনা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকায়। কিন্তু কেন রাজ্যকে নিতে হয় এই পরিমাণ ঋণ? অর্থ কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য হতে সংগৃহীত ৪১ শতাংশ কেন্দ্রীয় (২০১৪ পর্যন্ত এর পরিমাণ ছিল ৩২ শতাংশ) আয়ের অর্থ সরাসরি রাজ্যকে দেয় কেন্দ্র। বাকি ৫৯ শতাংশ অর্থ থাকে কেন্দ্রের নিজস্ব ব্যয় নির্বাহের জন্য। কেন্দ্র দু'টি প্রক্রিয়ায় এই ৫৯ শতাংশ অর্থ ব্যয় করে— (১) কর্মীদের মাইনে, পেনশন বাবদ রাজস্ব ব্যয়। (২) রেল, জাতীয় সড়ক, সেচ, জলপথ পরিবহণ, মেট্রো, বিমানবন্দর, সমুদ্র বন্দর, আয়ুত্মান ভারত স্বাস্থ্যবিমা, এইমস্ হ্রাসপাতাল ইত্যাদি কেন্দ্রীয় প্রকল্পে মূলধনী ব্যয়, যা পায় সব রাজ্যই। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই ৫৯ শতাংশ অর্থের মধ্যে নিজেদের ভাগ নিয়ে যাচ্ছে সব রাজ্য, বাদ থাকছে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ। কারণ গত দেড় দশক ধরে কেন্দ্রকে এই টাকা খরচ করতে দেয় না পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মেট্রো রেলের কাজ বন্ধ করতে আদালতে পর্যন্ত গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এমন উদাহরণ সারা দেশে গত ৭৯ বছরে একমাত্র তৈরি করেছে বর্তমান রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজ্যের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে এই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ গত ১৫ বছরে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। এর সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় বিনিয়োগের কারণে যে পরিমাণ শিল্প স্থাপন এবং ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটত, তার থেকে জিএসটি বাবদ বহু অর্থ আয় করত রাজ্য সরকার। যেমন, ২০১৬ সালে রাজ্যে যদি একটা বড়ো সমুদ্র বন্দর তৈরি হতো, তবে তার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ ও ব্যবসা আসতো এবং তা থেকে রাজ্য সরকারের বহু টাকা আয় হতো। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যদি রাজ্য সরকার পরিবর্তন হয় এবং নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে শুধুমাত্র যদি গত ১৫ বছরে বরাদ্দ হওয়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলিতে সবুজ সংকেত দেয়, তাহলেই আর কিছু করতে হবে না। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যা আয় বাড়বে, তাতেই এই পরিমাণ ভাতা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু রাজ্য সরকার গত ১৫ বছর এ রাজ্য থেকে সংগৃহীত কেন্দ্রীয় আয়ের ৫৯ শতাংশ অর্থের কোনো খরচ এখানে করতে দেয়নি। রাজ্য সরকার পরিবর্তন না হলে আগামীদিনেও দেবে না।

এখন এই অনুন্নয়ন ও বেকারত্বকে ঢাকতে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী ইত্যাদি প্রকল্প চালু করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। এইসব প্রকল্পের সুবিধাভোগী বা বেনিফিশিয়ারিরা কি সবাই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেয়? রাজ্য সরকারি তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পায় ২ কোটি ১৫ লক্ষ মহিলা এবং ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে এ রাজ্যে তৃণমূলের প্রাপ্ত ভোট ২ কোটি ৭৬ লক্ষ। তাহলে কি মাত্র ৬১ লক্ষ পুরুষ ভোট পায় তৃণমূল? এ রাজ্যের মুসলমানরা হলো তৃণমূলের নিশ্চিত

ভোটব্যাংক। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার তথ্য অনুযায়ী, এ রাজ্যে মুসলমান পুরুষ ভোটই তো এক কোটির কাছাকাছি। তাই চোখ বুজে বলা যায় যে, ৪০ শতাংশ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া মহিলা ভোট দেন না তৃণমূলকে। আর সেই জন্যই গত ৫ ফেব্রুয়ারি বিধানসভায় পেশ হওয়া ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেটে ঘোষিত হলো ‘যুবসার্থী’। বেকার ভাতা নামে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করা এই প্রকল্পে বরাদ্দ কত? পাঁচ হাজার কোটি টাকা। বছরে ১২ মাসের প্রতিটি মাসে রাজ্যের প্রায় ২৭.৫ লক্ষ মানুষ ১৫০০ টাকা করে পাবেন। অর্থাৎ প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় নয় হাজার ছেলে-মেয়ে এই ভাতা পাবে। যুবসার্থীর ভাতা পাওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পাওয়া মহিলারা বাদ থাকবেন, কিন্তু ‘ঐক্যশ্রী’ ও ‘মেধাশ্রী’ প্রাপ্তরা থাকবেন। কিন্তু কারা এই ঐক্যশ্রী বা মেধাশ্রী স্কলারশিপ পায়? উত্তর হলো—ওবিসিরা, এ রাজ্যে যাদের অধিকাংশই মুসলমান। সেখানেও প্রতিটি জেলায় হাজার হাজার ছেলে-মেয়েকে এই টাকার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

অনেকেই বলছেন এই টাকা কি যুবক-যুবতীদের নেওয়া উচিত? উত্তর হলো, কেন নয়? এতো তাঁদের করের টাকাই। যদি রাজ্য সরকারের অপকর্ম টাকার জন্য কোর্টে সওয়াল করে কপিল সিংবল, অভিষেক মনু সিংভিরা কোটি কোটি টাকা পেতে পারে, তো সাধারণ মানুষ কেন ১৫০০ টাকা নেবেন না? দিল্লির চাইতে এ রাজ্যে প্রতি লিটারে ১০ টাকা বেশি পেট্রল খরচ দিতে হলে কেন ১৫০০ টাকা নেবেন না রাজ্যবাসী? এ রাজ্যে যদি দিল্লির দ্বিগুণ বিদ্যুৎ বিল দিতে হয়; যদি দিল্লির মতো সরকারি স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা এ রাজ্যে না থাকে; যদি দিল্লির মতো কর্মসংস্থানের সুযোগসুবিধা এ রাজ্যে না থাকে; যদি পঞ্জাব-হরিয়ানা-উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের মতো ফসলের দাম এ রাজ্যের কৃষকরা না পান; তাঁরা যদি বিনামূল্যে সেচের জল না পান; বেকার যুবকদের অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতা যদি কেন্দ্রীয় হারে ডি.এ. না পান; এ রাজ্যের যুবসমাজ যদি কলেজে অধ্যাপনা করে দিল্লির অধ্যাপকদের ১০ শতাংশ মাইনে পান; এ রাজ্যের আশা ও আইসিডিএস প্রকল্পে কর্মরত দিদারা যদি কাজ করে দিল্লির আধা মাইনে পান; এ রাজ্যের প্যারা-টিচাররা যদি দিল্লির প্যারা-টিচারদের আধা মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য হয়; পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি অন্যান্য রাজ্যের মতো রাস্তা তৈরি করে না দেয়; সরকার পরিশ্রুত পানীয় জল দেয় না বলে কাউকে যদি বাড়িতে আর.ও. মেশিন বসিয়ে জলপান করতে হয়; রাজ্যে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন খরচ যদি সবচেয়ে বেশি হয়, তবে কেন কর্মহীন, উপার্জনহীন রাজ্যবাসী এই ১৫০০ টাকা নেবেন না? এই ডোল পলিটিক্স ও দান-খয়রাতি নির্ভর অর্থনীতি থেকে এ রাজ্যকে বেরিয়ে আসতেই হবে। নিজস্ব ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য একসময় বিশ্বের অন্যতম সম্পদশালী ভূখণ্ড ছিল বঙ্গভূমি। দীর্ঘ জলপথ, খনিজ সম্পদ, মানব সম্পদ কী নেই এই রাজ্যে? বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম আর্থিক শক্তি ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হলো পশ্চিমবঙ্গ।

ডোল রাজনীতির জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পরবতী বাঙ্গালি প্রজন্মের জন্য একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বদান-সহ বড়ো মাপের প্রশাসনিক ও আর্থিক সংস্কার এ রাজ্যে প্রয়োজন। □

# আরজি কর থেকে ডিএ, ফাইল কাণ্ড— সুপ্রিম কোর্ট ও পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির অদৃশ্য ইকোসিস্টেম

প্রতিটি ঘটনাই দেখাচ্ছে, আইনের ভাষা ও নৈতিক প্রত্যাশার মধ্যে অন্তর যত বাড়ে, জনআস্থা তত ক্ষয় হয়। আদালত কেবল রায় দেয় না; আদালত দেশের নৈতিক মানদণ্ডও স্থির করে।

সাধন কুমার পাল

আরজি কর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত (suo motu) হয়ে বিষয়টি নিজের হাতে নেয় এবং প্রধান বিচারপতির এজলাসে শুনানি হয়— ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মনে আশা তৈরি হয়েছিল; ‘এবার নিশ্চয়ই দৃষ্টান্তমূলক কিছু হবে।’ প্রশ্ন হচ্ছে হাইকোর্টের নির্দেশ : আইনি দিক থেকে কি যথেষ্ট ছিল না? কলকাতা হাইকোর্ট—

- তদন্ত নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে,
- প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থার হস্তক্ষেপের পথ খুলে দেয়,
- এবং রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণে রাখে।

আইনি দৃষ্টিতে বলতে গেলে, হাইকোর্টের নির্দেশ তদন্ত এগোনোর জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ও কার্যকর ছিল। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ না করলেও—

- তদন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল না,
- রাজ্যের আইনি কাঠামো ভেঙে পড়েনি।

সে জন্য সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছিল :

তাহলে সুপ্রিম কোর্ট কেন হস্তক্ষেপ করল ?

● ‘মানুষ বিচার পেল না’— জনমানসে এই ধারণা জন্ম নিল। একটি বড়ো প্রশ্ন উঠে এলো : প্রধান বিচারপতি ডি.ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্ট কি কোনো ‘নৈতিক বার্তা’ দিতে পারত না? এত বড়ো সামাজিক আঘাতের ক্ষেত্রে, কোর্ট চাইলে আরও কঠোর ভাষায়, নৈতিক দিকনির্দেশনা দিয়ে জনআস্থাকে দৃঢ় করতে পারত না? এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের মাথায় ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের মতো বিচারপতিদের হাত থাকার গুজব কি সত্য হয়ে উঠলো না?

**পশ্চিমবঙ্গের ডিএ মামলা ও প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই চন্দ্রচূড়ের সময়কাল :**

এই সময়কালে সুপ্রিম কোর্টের মাস্টার অব রোস্টার হিসেবে কোন মামলা কোন বেঞ্চে শুনানি হবে— সে বিষয়ে চূড়ান্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর হাতেই ছিল। ২০২২ সালের মে মাসে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ডিএ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

● এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ২০২২ সালের শেষের দিকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করে।

● ফলে চন্দ্রচূড়ের প্রধান বিচারপতির পুরো সময়কাল জুড়েই ডিএ মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন ছিল। তাহলে ‘শুনানি হয়নি’ বলা হয় কেন?

এখানেই মূল বিষয়টি পরিষ্কার করা জরুরি। প্রকৃত সত্য হলো ডিএ মামলা একাধিকবার সুপ্রিম কোর্টের তালিকায় উঠলেও— বিস্তারিত ও চূড়ান্ত শুনানি বারবার পিছিয়ে যায় কখনো বেঞ্চের সময়ের অভাব, কখনো বেঞ্চ পরিবর্তন, কখনো প্রশাসনিক কারণে মামলাটি শুনানি ছাড়াই মূলতবি হয়ে যায়।

অর্থাৎ এমন নয় যে মামলা একবারও কোর্টে ওঠেনি। কিন্তু এটাও সত্য যে মূল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ শুনানি বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের কার্যকালে কার্যত হতে পারেনি।

**কতবার মূলতুবি হয়েছিল ?**

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২০২৪ সময়কালে ডিএ মামলার শুনানি ১৫-১৮ বার পর্যন্ত পিছিয়েছে। প্রতিবারই ‘পরবর্তী তারিখে’ শুনানি হবে বলে মামলাটি স্থগিত হয়েছে, ফলে সরকারি কর্মচারীদের বহু প্রত্যাশিত এই মামলার নির্ণায়ক পর্যায়ে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় অবসর নেওয়ার পরবর্তী সময়ে (২০২৫-২৬ সালে) সুপ্রিম কোর্ট অবশেষে— অন্তর্বর্তী নির্দেশ দেয় (২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়ার নির্দেশ) এবং পরে চূড়ান্তভাবে ডিএ-কে আইনসিদ্ধ অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এখানে উল্লেখ্য, গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ সংক্ষেপে নির্দেশ দেয়; রাজ্য সরকারকে দরকারি ডিএ-র ২৫ শতাংশ বকেয়া টাকা ৩১ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে প্রদান করতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ বকেয়া ডিএ-র জন্য একটি কমিটি গঠন করে সেগুলোর জন্য কিস্তি-ভিত্তিক সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে।

এই কমিটি ৬ মার্চ, ২০২৬-এর মধ্যে সব হিসেব ও শিডিউল প্রস্তুত করবে এবং প্রথম কিস্তির ২৫ শতাংশ টাকা মার্চ ৩১, ২০২৬-এর মধ্যে দিতে হবে। তারপর রাজ্যকে এপ্রিল ১৫, ২০২৬-এ অবস্থা রিপোর্ট করতেও বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলছেন বিষয়টি নাকি এখনো বিচারাধীন। অর্থাৎ আবার কোনো আইনের ফাঁকফোকর খুঁজে সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ আবেদন করবেন। মানুষ কিন্তু প্রশ্ন তুলছে কাদের হাত রয়েছে মমতা ব্যানার্জির মাথায় যাদের ভরসায় তিনি সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করার জন্য তিনি আবার কোর্টে যাচ্ছেন?

**ইডির ‘ফাইল ডাকাতি’র অভিযোগ (মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে)**

- ইডি-র তল্লাশির সময় ৮ জানুয়ারি ২০২৬ মমতা ব্যানার্জি

আই-প্যাক কর্তৃক প্রতীক জৈনের বাড়ি ও অফিসে অভিযান চলাকালীন একটি ফাইল, হার্ড ডিস্ক ও ফোন নিয়ে বেরিয়ে আসেন বলে খবর আসে এবং ইডি দাবি করে যে অবস্থা বেগতিক মনে হচ্ছিল এবং তদন্তে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ নিয়েই রাজনৈতিক বিতর্ক ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা-বিচার চলছে। আইন বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই মামলায় মমতা ব্যানার্জি গ্রেপ্তার হতে পারেন। সেই সঙ্গে শাস্তির মুখে পড়তে পারেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার-সহ অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও আমলারাও। মমতা ব্যানার্জি আদালতকে খুব বেশি পাত্রা দেন না। আদালতের রায় না মানাটা তাঁর অভ্যাসের মধ্যেই আছে। তবু এই ফাইল চুরির ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে বাড়তি চাপে রেখেছিল।

ডিএ মামলার মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলা-সহ ইডির ফাইল কাণ্ডে অভিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রীর সামনে প্রধান বিচারপতিকে প্রভাবিত করার মতো একটি সুবর্ণ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। সেই সুযোগটি ছিল ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তের উপস্থিতিতে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান সরকারি সময়সূচি অনুযায়ী শুরু হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেদিন প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত বারণসী থেকে সরাসরি উড়ে বাগডোগরা বিমানবন্দর পৌঁছাতে প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগেছিল। এর ফলে তিনি নির্ধারিত অনুষ্ঠানে দেরিতে পৌঁছান।

সড়কপথে বাগডোগরা থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছাতে অনেক দেরি হচ্ছিল। এই খবর মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রধান বিচারপতির জন্য হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করেন। সেই হেলিকপ্টারে করেই প্রধান বিচারপতি অনুষ্ঠান স্থলে পৌঁছান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান এটা যেমন সত্য, তেমনি তিনি বিচারপতির এজলাসে একজন বিচারার্থী অভিযুক্তও বটে। সেজন্য একজন অভিযুক্তের কাছ থেকে কোনো ধরনের সুবিধা নেওয়া এটা নীতিগত ভাবে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। সূত্রান্ত এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছেই। প্রধান বিচারপতিকে প্রভাবিত করার জন্যই কি এই হেলিকপ্টার ফেসিলিটি? জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধনের দিন যা ঘটেছে তা কেবল পশ্চিমবঙ্গ বা একটি রাজ্যের সাধারণ ঘটনা নয়; এটি ভারতের গণতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থার সামনে এক খোলা চ্যালেঞ্জ। বিচারপতি সূর্যকান্তের সামনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, তা সম্ভবত ইতিহাসের পাতায় প্রথমবার ঘটল। মূলধারার সংবাদমাধ্যম হয়তো এর গভীরতা এড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর পেছনের সত্যটি অত্যন্ত ভয়ানক। এটি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী মোদী ও অমিত শাঁর বিরুদ্ধে এক রাজনৈতিক আর্তনাদ।

**সংবিধানের মধ্যে রাজনীতির আসর :** অনুষ্ঠানটি ছিল আইনি মর্যাদার, সংবিধানের ও বিচারব্যবস্থার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পবিত্র মঞ্চকেও নিজের রাজনীতির আখড়া বানিয়ে ফেললেন। সেখানে তিনি এমনভাবে আরজি জানালেন, যেন কোনো কেন্দ্রীয় এজেন্সি নয়, বরং স্বয়ং বিচারব্যবস্থা তাঁর পিছনে লেগেছে।

আইনের ফাঁস যখনই গলায় এসে আটকায়, তখনই মুখ্যমন্ত্রী সংবিধানের দোহাই দিতে শুরু করেন। প্রধান বিচারপতির সামনে তিনি বলতে থাকেন :

● সংবিধান বাঁচান, ● গণতন্ত্র বাঁচান, ● বিচারব্যবস্থা বাঁচান, ● দেশের

সীমান্ত বাঁচান, ● ইতিহাস ও ভূগোল বাঁচান।

এরপর তিনি আসল বিষয়টি উগরে দিয়ে বললেন যে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলো মানুষকে হেনস্থা ও বদনাম করছে। এর পরিষ্কার অর্থ হলো— ইডি এবং সিবিআই-এর হাত থেকে বাঁচান, মোদী-শাঁর হাত থেকে রক্ষা করুন। যে নেত্রী নিজের রাজ্যের পুলিশকে ঢাল বানিয়ে তদন্ত বাধাগ্রস্ত করেন, আজ যখন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাপ বাড়ছে, তখন প্রধান বিচারপতির সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করছেন।

**বিচারবিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা ?**

এটি কোনো সাধারণ আবেদন নয়; বরং আদালতের ওপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টির কৌশল। কারণ মামলাটি এখন বিচারার্থী, একাধিক নোটিশ জারি হয়েছে এবং একের পর এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন উঠছে। মুখ্যমন্ত্রী ভালো করেই জানেন যে, এবার পার পাওয়া সহজ হবে না। যদিও তিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে দাবি করেছেন যে তিনি নিজের জন্য নয়, বরং মানুষের জন্য বলছেন— কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই হাহাকার তাঁর নিজের ক্ষমতা ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাকে বাঁচানোর জন্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার কথা বলেন, তখন মনে রাখা প্রয়োজন যে তাঁর নিজের রাজ্যেই মহিলা সাংবাদিকরা আক্রান্ত হন আর পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাঁর কাছে গণতন্ত্র ও সাংবাদিকতা কেবল তখনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, যখন তাঁর নিজের দলের অপকর্ম ফাঁস হতে শুরু করে।

রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য মমতা ব্যানার্জি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। একদিকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের দিয়ে ভুল তথ্য নথিভুক্ত করে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে এই প্রক্রিয়াকে ঠেকানোর চেষ্টা করছেন। প্রধান বিচারপতিকে প্রভাবিত করার জন্য নিজে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলেন, চেষ্টা করলেন প্রক্রিয়া বন্ধ করানোর। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই হেলিকপ্টার ডিপ্লোমাসি কিংবা সার্কিট বেঞ্চ উদ্বোধনের সময় মঞ্চ শেষার করে প্রধান বিচারপতিকে যতখানি প্রভাবিত করা হয়েছে তার সুযোগ নেওয়ার জন্যই কি উনি সশরীরে কোর্টে উপস্থিত ছিলেন? আদালতের রায় মানার ব্যাপারে মমতা সরকারের ধারাবাহিক রেকর্ড দেখে এবং ফাইল কাণ্ড তারিখের উপর তারিখ দেওয়ার ধরন দেখে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে এই মামলার পরিণতি সেই ডিএ মামলার মতো হবে না তো?

**আইনি কৌশল বনাম নৈতিক জবাবদিহি :** গণতন্ত্রে দক্ষ আইনজীবী থাকা অপরাধ নয়— বরং তা ন্যায়বিচারের স্বাভাবিক অংশ। কপিল সিংবলদের মতো অভিজ্ঞ ব্যারিস্টাররা রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করবেন, আইনি পথ খুঁজবেন— এটা তাঁদের পেশাগত দায়িত্ব। কিন্তু যখন সেই আইনি কৌশল বারবার শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার বাস্তবতায় পরিণত হয়, যখন 'তারিখের পর তারিখ' নিজেই হয়ে ওঠে প্রধান চরিত্র, তখন প্রশ্ন ওঠে— বিচার কি কেবল প্রক্রিয়া, নাকি তারও একটি নৈতিক আত্মা আছে?

আরজি কর মামলা, ডিএ মামলা, ফাইল-কাণ্ড— প্রতিটি ঘটনাই দেখাচ্ছে, আইনের ভাষা ও নৈতিক প্রত্যাশার মধ্যে অন্তর যত বাড়ে, জনআস্থা তত ক্ষয় হয়। আদালত কেবল রায় দেয় না; আদালত দেশের নৈতিক মানদণ্ডও স্থির করে। সেই মানদণ্ড যদি দৃশ্যমান না হয়, তবে 'অদৃশ্য ইকোসিস্টেম' শব্দবন্ধটি জনমানসে জায়গা করে নিতেই পারে।

# নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর মানুষের অনাস্থা প্রকট হয়

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞা সমগ্র বিশ্বে বন্দিত—যার মূল স্তম্ভ হচ্ছে ‘of the people, for the people’ এই শর্তটি লঙ্ঘিত হলে বাকি শর্তগুলি অর্থহীন হয়ে যায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরবর্তী নির্বাচনে জনমতের মুখোমুখি হতে হয়। তাই জনস্বার্থে নীতি নির্ধারণ ও জবাবদিহিতা গণতন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ক্যানিং পশ্চিম ব্লকের কোথাও কোথাও নির্বাচন ছাড়াই তৃণমূলের এক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষিত হয়, কারণ অন্য কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দাখিল করতেই দেওয়া হয়নি। এই যদি গণতন্ত্রের মডেল হয় সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণা অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, বরং এরকম ঘটনা গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্রের নগ্নরূপ। তাই ভারতবর্ষের

সংবিধানে বিচারবিভাগ এবং নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্ত সাংবিধানিক সংস্থা হিসাবে, যাতে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারও এদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে না পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গণতন্ত্রের প্রহরী হিসেবে এবং অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনায় স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অপরিসীম—ভারত-সহ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে এধরনের প্রতিষ্ঠান বর্তমান। ভারতে সংবিধান চালু হওয়ার পরে ১৯৫১ সাল থেকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে আসছে—নির্বাচনে কোথাও অনিয়ম ও কারচুপি হয়ে থাকলে তার দায় প্রশাসনের। কারণ পুলিশ প্রশাসন থাকে রাজ্যের হাতে। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ না হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর মানুষের অনাস্থা

প্রকট হবে। অনেকেই ভাবতে শুরু করবেন এর থেকে লোকহিতৈষী একনায়কতন্ত্র ভালো, কেননা ওই ব্যবস্থায় দ্রুত জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। সমৃদ্ধিশালী হয় দেশের মানুষ। তার উদাহরণ চীন, যদিও রাজনীতির কারবারীদের ওইরকম ব্যবস্থায় প্রবল আপত্তি। তাই অগণতান্ত্রিক গণতন্ত্রে প্রসঙ্গান্তর হওয়াই শ্রেয়।

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের ১২টি রাজ্যে বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের SIR (Special Intensive Revision of electoral Roll)-এর কাজ চলছে। এর মধ্যে বিজেপি শাসিত এবং বিরোধী শাসিত রাজ্য রয়েছে। একটু-আধটু সমস্যা অন্য রাজ্যে থাকলেও গোল বেঁধেছে পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে। নির্বাচন কমিশন মমতা ব্যানার্জির সরকারের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন। বিহারের পরে পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর পালা জেনেই পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনসমাবেশে ঘোষণা করেন তিনি জীবিত অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গে SIR হতে



দেবেন না। যখন তিনি দেখলেন তাঁর হুমকির পরেও SIR-এর সিডিউল ঘোষণা করেছেন কমিশন অর্থাৎ তাঁর জীবদ্দশায় SIR চালু হচ্ছে, তখন তিনি নানাভাবে (দলীয় ও প্রশাসনিকভাবে) SIR প্রক্রিয়াতে অন্তর্গত শুরু করলেন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশমতো BLO এবং Data Entry Operator নিয়োগে বিলম্ব করে SIR প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মাধ্যমে ইলেকশন কমিশনকে অপমানিত এবং মানুষের চোখে হয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত না হয়ে, BLO/ERO/AERO-দের ভয় দেখিয়ে রাজ্যের সরকারি কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়েছেন, অর্থাৎ কমিশনের নয়, রাজ্যের নির্দেশমতো চলার পরামর্শ।

মুখ্যমন্ত্রীর সম্ভাব্য উত্তরসূরি—তৃণমূল দলের সর্বভারতীয় সভাপতি শ্রীমান অভিষেক ব্যানার্জি পিসির প্রদর্শিত পথে আর এক ধাপ এগিয়ে ইলেকশন কমিশন নির্ধারিত Legacy documents প্রসঙ্গে জনসভায় প্রশ্ন তোলেন— ‘ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বাবার নাম আছে ভোটার লিস্টে? রেলমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী দিতে পারবেন বাপ-ঠাকুরদার বার্থ সার্টিফিকেট? বিজেপির লোকেরা বাড়িতে এলে তাদের বাপ-ঠাকুরদার বার্থ সার্টিফিকেট চাইবেন—দিতে না পারলে বেঁধে রাখবেন’ ইত্যাদি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদকের তথা এই ফতোয়ার পরে থামে-গঞ্জে বিজেপির কর্মকর্তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন এবং সাম্প্রতিক বিধানসভা ভোটে রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেদের দূরে রাখবেন এটাই স্বাভাবিক। ভোট নিয়ে বাড়িবাড়ি করলে কী ফল হতে পারে, ২০২১ এর বিধানসভা ভোটের পরে হিংসা, বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি ও সম্পত্তি ধ্বংস এবং বহু কর্মীর জীবননাশ তার প্রমাণ। অতীতে আক্রান্ত বিজেপি কর্মকর্তা বা সমর্থকরা না পেয়েছেন পুলিশি নিরাপত্তা বা সরকারি সহায়তা। নির্বাচন কমিশনের অবাধ ও শাস্তি পূর্ণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি বারবার ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে— কেন্দ্রীয় বাহিনীর ২/৪ জন সদস্য উপস্থিত থাকলেও

তারা বুথের ভিতরে কারচুপি এবং ভোট কেন্দ্রের বাইরে সমস্ত ভোটারদের নিয়ে আসার দায়িত্ব নিতে পারেন না, তাদের কাজ করতে হয় রাজ্য পুলিশের অধীনে। যাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে জনমানসে গভীর সন্দেহ কাজ করে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বেশি সংখ্যায় Deploy করা হয় যেখানে বিরোধীরা শক্তিশালী, আর সন্দেহখালির মতো জায়গায় সাজাহানদের ফ্রি হ্যান্ড দিতে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দেখা যায় বসিরহাটের বেসক্যাম্পে ক্যারামবোর্ড খেলতে। এ ঘটনা ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের পরের দিন সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি যাত্রার আগে কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য এমনকী কমিশনের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে তির্যক বিদ্রূপ করেন। তিনি সংবাদমাধ্যমে বলেন—কে ভোটার, আর কে না তা ঠিক করবেন জনগণ, ইলেকশন কমিশন নয়। অর্থাৎ দেশের নির্বাচন কমিশনের একটি স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা করার অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন নিরপেক্ষ ও শাস্তি পূর্ণ ভোটগ্রহণের ক্ষমতা যে বাস্তবে কমিশনের নেই, সেকথা মুখ্যমন্ত্রীর থেকে ভালো কে জানেন অর্থাৎ ইলেকশন কমিশন চাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।

একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি সাংবিধানিক সংস্কার এক্তিয়ার নিয়ে বার বার চ্যালেঞ্জ করছেন। কমিশনের নির্দেশ ডাস্টবিনে ফেলে দিচ্ছেন। তিনি কথায় কথায় সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন, খানিকটা প্রশ্রয় পেয়ে আরও গলা চড়াচ্ছেন, যাতে অবৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়া হয়। এছাড়া তো কমিশনের সঙ্গে অন্য কোনো বিরোধ থাকার কথা নয়। কর্মীদের অসহযোগিতায় ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার কারণে কোনো বৈধ ভোটারের নাম বাদ না যায়। তা ঠিক করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আছে। সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীর বেদনার জায়গাটা প্রকৃত পক্ষে অবৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে। এই সহজ কথাটা কারও না বোঝার অবকাশ নেই। একথা ঠিক SIR প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত তথা তৃণমূলের অন্তর্গাতের কারণে নানা জায়গায়

অশাস্তি ও বিক্ষোভের মুখে পড়েছিল ERO/AERO এবং সং BLO-রা। কিছু ভোটার বা BLO দায়িত্বপ্রাপ্তের মৃত্যুর খবরও সামনে আসছে। নির্বাচন কমিশনের নিত্যানতুন ফতোয়া এবং তৃণমূলের হুমকিতে অনেকেই ভীত-সম্বস্ত। ভুল তথ্য Entry করলে কমিশনের কোপ, না করলে তৃণমূলের হুমকি, এ দু'য়ের মধ্যে পড়ে BLO কর্মীদের অসহায় অবস্থা।

ভারতের নির্বাচন কমিশন ০৪.১১.২০২৫ থেকে ০৮.০২.২০২৬-এর মধ্যে SIR প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার কর্মসূচি নিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে যা পরিস্থিতি তাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমনকী সামান্য বর্ধিত সময়ের মধ্যেও কার্যক্রম শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ দানা বেধেছে। ওদিকে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন। তিনি আশান্বিত ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারালয় থেকে সুবিধাজনক রায় পাবেন। কেননা ইতিমধ্যেই আদালত কিছু ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্তে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তবে সাধারণ মানুষ যারা আশা করে বসে আছেন, SIR প্রক্রিয়া অবিলম্বে সম্পন্ন না হলে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে এবং রাষ্ট্রপতি শাসনে নির্বাচন হবে, তাঁরা জেনে রাখুন এমনটা হলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পুরো রাজ্য অস্থির করে তুলবেন, তা মোকাবিলা করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে তো?

যে সমস্ত গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ SIR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুধুমাত্র বৈধ ভোটারদের নিয়ে একটা ত্রুটিহীন ভোটার তালিকা তৈরি হবে ভেবে SIR-কে স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁরা কিন্তু বর্তমান মেলোড্রামা দেখে হতাশ। দেখে শুনে মনে হচ্ছে—কেবলমাত্র মৃত ভোটার, স্থানান্তরিত ভোটার এবং একাধিক তালিকায় নাম থাকা ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে নির্বাচনে বাকিদের নিয়ে তালিকা তৈরি করে ভোট হবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই, এটাই এই প্রতিবেদকের ধারণা। ভারতীয় গণতন্ত্রের যে দশা তাতে গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোটাধিকার, আইনের শাসন, আইনের চোখে সবাই সমান। এ সমস্ত কেতাবি কথাগুলি তুলে রেখেই আমরা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের অভিবাসী। □

# বাংলাদেশে জেহাদিতন্ত্রের উত্থান দেশটিকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নির্বাচন তিলে তিলে উন্নয়নের পথে এগিয়ে  
যাওয়ার পথটাকে আরও মসৃণ করবে, না ১৯৭১ পূর্ববর্তী ভারত-  
বিরোধিতার পুনরাবৃত্তি হবে তা সময়ই বলবে?

সোমনাথ গোস্বামী

সম্প্রতি একটি বাংলাদেশি চলচ্চিত্রের অন্তর্ভুক্ত একটি দেশাত্মবোধক গান শুনতে শুনতে চোখটা হঠাৎই পর্দায় আটকে গেল। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে গায়ক আসিফ আকবর বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার উপর পা রেখে হাঁটু গেড়ে বসে গানটির সঙ্গে ঠোঁট মেলাচ্ছেন। সহসাই মনে পড়ে গেল প্রভু চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর কথা। শেখ হাসিনাকে বিতাড়নের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের হিন্দুদের নানান দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হওয়া ‘বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের’ মুখপাত্র এই সন্ন্যাসীর মুখ বন্ধের জন্য একটি অজুহাত এমনিতেই হন্যে হয়ে খুঁজে চলেছিল ইউনুস প্রশাসন। অবশেষে সনাতন জাগরণ মঞ্চ আয়োজিত একটি সভায় উত্তোলিত একটি ধর্মীয় পতাকার উচ্চতা পাশে থাকা বাংলাদেশ জাতীয় পতাকার উচ্চতার চেয়ে বেশি মনে হওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হতে হয় তাঁকে। তবে এভাবে যে বেশিদিন মানুষের মুখ বন্ধ রাখা যাবে না তা ‘মেটিকুলাস ডিজাইন’-এর মাথারা খুব ভালো করেই জানতেন। সংখ্যালঘুদের আশা ভরসার স্থল হয়ে ওঠা এই সন্ন্যাসীর কণ্ঠ অবদমিত রাখতে প্রয়োজন ছিল আরও কঠিন ধারা। তবে তারজন্য সর্বদা নিজের অনুগামীদের মাতৃভূমির প্রতি অনুগত থাকার বার্তা দেওয়া এবং পুলিশি হেফাজত থাকা অবস্থায় আদালতে যাওয়া ওই সন্ন্যাসীকে কীভাবে তাঁর জায়গা থেকে প্রায় ৮০০ মিটার দূরে সংঘটিত এক হত্যাকাণ্ডে জড়িত করা যায় তা বোধবুদ্ধির বাইরে। অবশ্য যে আইনে জসীম উদ্দিন রহমানির মতো কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদীর অবলীলায় জেলমুক্তি ঘটে; সেই আইন যে কয়েকমাস পরেই এক হিন্দু সন্ন্যাসীর হাতে শিকল পরাবে তা কতকটা অভিপ্রেতই বলা যায়।



তবে এমনটা নয় যে বাংলাদেশ হঠাৎ করেই অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে জেহাদিদের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে। বরং এটা বলা যেতে পারে যে, দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জেহাদিদের বোতলবন্দি করার যে কাজ সুসম্পন্ন হয়ে চলেছিল সেই বোতলের ছিপি অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে খুলে দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনাও মোল্লাবাদীদের বহু অন্যান্য দাবি মেনে নিয়েছিলেন। ফলস্বরূপ শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা এখন অতীত। নোবেলজয়ী একটি মুখকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করে পদ্মাপারের মসনদের

আসল স্টিয়ারিং এখন রাজাকার গোলাম আজমদের উত্তরসূরীদের হাতে। আর এই পরিস্থিতিতে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে পাকিস্তানও। একান্তরের পরাজয়ের ক্ষততে মলম লাগানো এবং বাংলাদেশকে পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত করার জন্য তাদের বাজি গোলাম আজম-পুত্র আমান আজমিরের মতো ব্যক্তির। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে মুসলিম লিগের আঁতুরঘর ঢাকা ভারত বিরোধিতায় পশ্চিম পাকিস্তানের অংশীদারিত্বে ভাটা পড়ার আশঙ্কায় খাজা নাজিমুদ্দিন লবির হোসেন সৈয়দ সোহরাওয়ার্দিকে ‘ভারতীয় চর’ বলে প্রতিপন্ন করা হোক বা ফজলুল হকের কলকাতায় নিহত হওয়ার গুজব ছড়ানো থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে কলকাতায় মহাজাতি সদনে সংবর্ধনা গ্রহণের ‘অপরাধে’ সেই ফজলুল হককেই আবার অপমানিত করা বা সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পরে ভারত সরকারের কাছ থেকে নিজের গৃহ নির্মাণের অর্থ না পেয়ে মৌলানা ভাসানীর—ভারত-বিরোধিতার পথ বেছে নেওয়া, ভারত-বিরোধিতার মোহে জনগণকে আচ্ছন্ন করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা বারবার পরিলক্ষিত হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে। সাম্প্রতিক সময়ে টাকির আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিজয়া দশমীর দিন দুই বঙ্গের মেলবন্ধন দেখতে অভ্যস্ত অনেক বাঙ্গালিই আজ জানে না, বিএসএফ মোতায়নের আগে, সদ্য স্বাধীন ভারতের পূর্ব সীমান্তে পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একক দক্ষতায় মুর্শিদাবাদে সশস্ত্র পাকিস্তানি বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি রক্ষা করার বীরত্বের কাহিনি। প্রশ্ন উঠবে, তাহলে কী এমন হলো যে আদ্যস্ত ভারত-বিরোধী পূর্ব পাকিস্তানকে ‘বাংলাদেশে’ পরিণত হওয়ার সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হলো? উত্তরে বলা যায়, সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নানাবিধ বৈষম্য পূর্ববঙ্গের মানুষের মনে যেভাবে প্রভাব

ফেলছিল তার সামনে ভারত-বিরোধিতার প্রভাব ধীরে ধীরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। এছাড়া ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ইতিহাসের মোড় এমনভাবে ঘুরিয়ে দেয় যে তা ‘মুক্তির দাবি’কে উসকে দিয়ে ১৯৬৬-র ছয়দফা থেকে চলতে ১৯৬৯-এর অভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর নির্বাচিত হয়ে পর্যবসিত হয় মুক্তিযুদ্ধে।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ দেখে উল্লসিত পাকিস্তান মনে করেছিল তারাও অতর্কিতে হামলা করে কাশ্মীর দখল করে নিতে পারবে। কিন্তু তাদের স্বপ্নে বাধ সাধে কাশ্মীরের সাধারণ জনগণ। পাকিস্তানের দেখানো প্রলোভন উপেক্ষা করে তাঁরা স্থানীয় কাশ্মীরি নাগরিকের ছদ্মবেশে পাকিস্তানি সেনার জড়ো হওয়ার খবর পৌঁছে দেয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের অতর্কিত শুরু করা যুদ্ধ মূলত পশ্চিম প্রান্তে শুরু হলেও তার রেশ এসে পড়ে পূর্ব সীমান্তেও। তবে পূর্ব সীমান্তে ভারতীয় বিমানবাহিনীর সামনে যে পাকিস্তান এভাবে নাস্তানাবুদ হবে তা হয়তো পাকিস্তানের অতি বড়ো সমর বিশেষজ্ঞও ভাবতে পারেননি। খজাপুরের কলাইকুণ্ডাতে হামলা চালাতে এসে পাক বিমানের ধরাশায়ী হওয়া এবং ভারতীয় বিমানবাহিনীর অবলীলায় তবে সীমিত আকারে ঢাকায় বিমানঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ পূর্ব পাকিস্তানের মনে জন্ম দিয়েছিল এক আতঙ্কের। ওদিকে লাহোর রক্ষার তাগিদে পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থাও তখন একইরকম। পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার মতো সামর্থ্য তখন তাদের নেই। ভারত-বিরোধিতায় খামতি না থাকলেও প্রকৃত সময়ে বাঙ্গালি ভাইদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের যে কোনো মাথাব্যথা নেই একথা ততদিনে বেশ বোঝা হয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের। ধৈর্যশীল ভারতের ঔদার্যে সেবারের মতো বেঁচে গেলেও ভবিষ্যতে উসকানির জবাবে যে পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংসস্বূপে পরিণত হতে পারে তা উপলব্ধি করে তড়িঘড়ি ঢাকার তরফে

বিবৃতি দেওয়া হয় যে, নয়াদিল্লির সঙ্গে ঢাকার বিরোধ নেই।

ওই বছরেরই সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতি হলেও, ভারতীয় বিমানবাহিনীর পরাক্রম ঢাকার মনে চিরস্থায়ী রূপে আতঙ্কের জন্ম দেয়। সেই আতঙ্কের ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের ভারত-বিরোধী শক্তির পায়ে তলার মাটিও ধীরে ধীরে আলগা হতে থাকে। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ সময় পর পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ থেকে মুক্ত হলেও, বাংলাদেশের অভ্যন্তরের অপশক্তি যে রক্তবীজের মতো নিজের জাল পুনরায় বিস্তার করার চেষ্টা করছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল মুজিব হত্যার মধ্যে দিয়ে। পরবর্তীতে নানান ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অবশেষে একটা দীর্ঘ সময় অবধি বাংলাদেশের ব্যাটন ছিল মুক্তিযুদ্ধের মুক্তচিন্তার পক্ষের শক্তির হাতে। অপরদিকে নানান অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশের প্রতি পালন করে গেছে প্রকৃত বন্ধুর দায়িত্ব। ছিটমহল সমস্যার সমাধান এই দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের এক অন্যতম সাফল্য হিসেবেই পরিগণিত হবে। বন্ধু ভারতের অপারিসীম ঔদার্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী অপশক্তি ভুলেছিল ১৯৬৫-র যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর পরাক্রম। তাদের স্পর্ধা হয়েছে ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করার। সাম্প্রতিক বাংলাদেশের নির্বাচন তিলে তিলে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে আরও মসৃণ করবে, না ১৯৭১ পূর্ববর্তী ভারত-বিরোধিতার পুনরাবৃত্তি হবে তা সময়ই বলবে? বাংলাদেশ কোন পথকে বেছে নেবে সেই সিদ্ধান্ত তার। তবে এমতাবস্থায় বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিকারক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গবাসী শিল্প-সম্ভাবনার পথকে আরও ত্বরান্বিত করে রাজ্যের অগ্রযাত্রাকে জয়যাত্রায় রূপান্তরিত করে সমগ্র পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রটিরই আমূল পরিবর্তন করতে পারে কিনা সে ভাবনা এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গবাসীকে ভাবতে হবে। □

# ত্বককে বসন্তকালে ঠিক রাখতে প্রচুর জল খেতে হবে

ডা: ইমরান ওয়ালি

এখন বসন্তকালের শুরুর সময়। শীত গিয়ে গরমের একটা আবহাওয়া আসছে। এই সময়ে আমাদের ত্বক কিন্তু নানাভাবে সংক্রমিত হয়। ত্বকের এই সংক্রমণ আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বেশ ব্যাহত করে।



এই সময়ে আমাদের কাছে একটি রোগ নিয়ে বহু মানুষ আসেন। সে ছোটো হোক বা বড়ো। সেই রোগটি হলো চিকেন পক্স। তার আগে একটু বলে নেওয়া ভালো যে, এই সময়ে আমাদের ত্বক বেশ শুষ্ক থাকে। আর আমাদের ত্বক নানাভাবে অ্যালার্জির সংক্রমণে পড়ে। একদিকে যেমন শুষ্ক ত্বকের সমস্যা ও আবহাওয়া শুষ্ক থাকার জন্য পা ফাটে, আবার যেই একটু গরম পড়তে শুরু করল হিউমিডিটি বেড়ে গেল। নতুন সমস্যা দেখা দেয়— দাদ,

চুলকানির সংক্রমণ বাড়ে। ফলে শুরু হয় অস্বস্তি। বড়োদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে একটু বয়স্কদের ক্ষেত্রে একটি অন্য রোগ দেখা দেয়। সেটি হল হারপিস। এই রোগ সাধারণত হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে। এই রোগে আবার বাড়াবাড়ি হয় যদি অন্য রোগ যেমন—

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস বা সুগারের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে রোগের সংক্রমণের মাত্রাটা একটু হলেও বাড়ে।

আর একটি সমস্যা সাধারণত এই সময়ে দেখা যায়। সেটা হলো খুসকি। এই খুসকির কারণে চুল উঠে যায়। ফলে এর থেকেও

রেহাই পাওয়ার রাস্তা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। কীভাবে! আমরা বলে থাকি নিয়মিতভাবে মাথায় শ্যাম্পু করতে। পারলে একদিন অন্তর শ্যাম্পু করলে ভালো হয়। এছাড়াও বাজারে অনেক অ্যান্টি ড্যানড্রাফ লোশন পাওয়া যায়, সেগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এবার আসা যাক শুষ্ক ত্বকের ক্ষেত্রে। ত্বককে তৈলাক্ত করে রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। আর একটি বিষয়ে মনে রাখতে হবে, জলটা প্রচুর



পরিমাণে পান করতে হবে। বেশি জল খেলে ত্বকের স্বাভাবিকত্ব রক্ষা পায়। নিজেকে ও নিজের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ধোঁয়া ও ধুলো-বালি এড়িয়ে চলতে হবে। প্রয়োজনে মাস্ক ব্যবহার করতে পারেন।

চিকেন পক্সের সেই অর্থে কোনো ওষুধ নেই। তাই আমরা বলে থাকি, প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি খেতে। এই শাকসবজি আমাদের রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়। আমাদের খাবারের তালিকায় এমন বিষয় রাখতে হবে, যেখানে একটা সুস্বাদু খাদ্যপ্রাণ রক্ষিত হয়। অন্য দিকে আমাদের শরীরের যে ঘাটতিগুলো আছে, সেগুলি পূরণ করে। আমাদের ইমিউনিটি বাড়ায়।

তবে শেষ একটা কথা বলতেই হয়, ত্বক হচ্ছে আমাদের শরীরের বহিরঙ্গ। তাকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার জন্য খাদ্যাভ্যাস ও ত্বকের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জরুরি, তেমনই যত্নবান হওয়াটাও প্রয়োজন। কোনো বিষয়ে যদি বেশি অস্বাভাবিক মনে হয় তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি।

(লেখক চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ)

# শীত থেকে বসন্ত : খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন

## দিতি ভট্টাচার্য

গরমের দিনগুলি শুরু হতে চলেছে, গ্রীষ্মকাল বছরের সবচেয়ে উষ্ণতম ঋতু। গ্রীষ্মকালীন তীব্র তাপ, উচ্চ আর্দ্রতা এবং চড়া রোদের সংস্পর্শ নিয়ে আসে বিরক্তিকর আবহাওয়া। ফলস্বরূপ, শরীরে বেশ কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। বেশি ঘাম হয়, যা জলশূন্যতা, খনিজ পদার্থের ক্ষয় এবং ক্লান্তির কারণ হয়। ক্ষিদে কমে যায়, হজমশক্তি কমে যায় এবং হিটস্ট্রোক, রোদে পোড়া বা ইলেকট্রোলাইট ভারসাম্যহীনতার মতো অসুস্থতার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এসময় ঘাম ও প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীরের থেকে জল বের হয়ে যায়। যে কারণে শরীরে জলের ঘাটতি তৈরি হতে পারে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত যেগুলো শরীরকে ঠাণ্ডা ও হাইড্রেটেড রাখে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময় এসেছে খাবারের তালিকা ও জীবনযাপনে পরিবর্তন আনার। এই সময়ে সুস্থ থাকার জন্য খাদ্য নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ। এসময় খাবার খাওয়া কেবল শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে না বরং হজম ও ত্বকের স্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে। শরীর ঠাণ্ডা রাখার খাবারগুলি সহজ, প্রাকৃতিক এবং সহজেই পাওয়া যায়।

অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও ফল ও শাকসবজি স্থানীয় তাপমাত্রার পাশাপাশি সেই অঞ্চলের মাটির গুণমানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই, প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ফল বা শাকসবজি উপেক্ষা করা হয়, যেখানে এই ঋতুতে পাওয়া ফলগুলি রসালো এবং প্রচুর পুষ্টিগুণ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এর মধ্যে কিছু ফল এই শুরু তাপে আমাদের ঠাণ্ডা থাকতেও সাহায্য করে। এই সময়ে আমরা অন্যান্য ঋতুর চেয়ে বেশি তৃষ্ণার্ত থাকি। তাই এসময় এমন খাবার খেতে হবে যাতে জলের পরিমাণ থাকে বেশি।

শরীরের তাপের বৃদ্ধি তখন ঘটে যখন শরীর তার নিজস্ব তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। এর কিছু সম্ভাব্য কারণ হলো গরম তাপমাত্রা, বেশি এসডিএ (বেশি তাপ উৎপাদনকারী খাবার) যুক্ত খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত জল পান না করা,

মশলাদার বা বেশি তেলযুক্ত, ভাজা খাবার বেশি খাওয়া এবং কিছু অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যগত উদ্বেগ। খাবার হলো শরীরকে ঠাণ্ডা রাখার সবচেয়ে সহজ প্রাকৃতিক উপায়গুলির মধ্যে একটি। শরীরের তাপমাত্রা স্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রাখতে এবং ঠাণ্ডা থাকতে এমন কিছু খাবার গ্রহণ করতে হবে



যা শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে, বিশেষ করে যখন বাইরে গরম থাকে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফল ও সবজি আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকার অংশ হওয়া উচিত।

**নারিকেলের/ডাবের জল :** হাইড্রেটেড থাকার একটি প্রাকৃতিক উপায় এবং শরীরকে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর পটাশিয়াম রয়েছে।

**তরমুজ :** তরমুজে ৯০ শতাংশের বেশি জল থাকে, তাই এটি শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। এতে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও।

**শসা :** ৯৫ থেকে ৯৬ শতাংশ জল থাকায় শসা আর্দ্রতা প্রদানকারী। দিনে দুই থেকে তিনটি শসা বেশ উপকারী। পটাশিয়াম এবং ভিটামিন-ই-এর উপস্থিতি ত্বককে পুনরুজ্জীবিত করতে সাহায্য করে।

**পুদিনা :** পুদিনার শরীরকে ঠাণ্ডা করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি সতেজতাও প্রদান করে।

**ঘোল :** এটি একটি জনপ্রিয় পানীয় যা দই, জল ও কিছু মশলা দিয়ে তৈরি হয়। এই পানীয়টি শরীরের তাপমাত্রা স্থিতিশীল রাখে এবং হজমশক্তিও উন্নত করে।

**অ্যালোভেরা :** অ্যালোভেরার রস শরীরের

তাপমাত্রা ও ফোলাভাব কমানোর সাহায্য করে। এটি ত্বক ও পেটকেও স্বাস্থ্যকর করে তোলে।

**লেবু চিনি লবণ জল :** এটি প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে। ঘামের মাধ্যমে বেরিয়ে যাওয়া সোডিয়ামের ঘাটতি পূরণ করতে সাহায্য করে।

**আখের রস :** প্রাকৃতিক ভাবে তেঁস্তা মেটায়। আখের রসে থাকে প্রচুর আয়রন। এর শ্রেষ্ঠ উপযোগিতা পেতে লেবুর রস সহযোগে গ্রহণ করা উচিত।

**আনারস :** ৮৭ শতাংশ জল ধারণ করে, তাই এটি গরমের দিনে ভালো হাইড্রেটিং বিকল্প।

**টমেটো :** টমেটোতে প্রায় ৯৫ জল থাকে। এগুলি কাঁচা বা তরকারি বা চার্টনি আকারে খাওয়া যেতে পারে। এগুলি ভিটামিন-সি, পটাশিয়াম, ফোলেট এবং ভিটামিন-কে-এর ভালো উৎস।

**পেঁয়াজ :** এর মধ্যে শীতলতা বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাঁচা পেঁয়াজ শরীরকে ভেতর থেকে ঠাণ্ডা রেখে হিটস্ট্রোক প্রতিরোধেও সাহায্য করে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

**পাতলা সবজি স্যুপ :** জল ও ভিটামিন মিনারেলের ভালো উৎস।

**জল :** প্রতিদিন অবশ্যই তিন থেকে চার লিটার পরিপূর্ণ পানীয় জল গ্রহণ করতে হবে।

**ঘেসব খাবারগুলো এড়িয়ে চলা উপকারী :** বেশি মশলাদার খাবার। গরমের মধ্যে উচ্চ প্রোটিন যুক্ত খাবার (বেশি এসডিএ) বাসি, পচা খাবার। অত্যধিক চিনি ও লবণ যুক্ত খাবার। উচ্চ ফ্যাট যুক্ত খাবার। ফাস্ট ফুড, জাংক ফুড। অত্যধিক চা ও কফি। যদি তাপ-সম্পর্কিত ক্লান্তি, জলশূন্যতা বা হজমের অস্বস্তির ক্রমাগত লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে এগুলি উপেক্ষা না করে অবিলম্বে চিকিৎসক ও ডায়েটিশিয়ানের পরামর্শ নিতে হবে।

এক্ষেত্রে এও মনে রাখা প্রয়োজন যে, একজনের জন্য যে খাবারটি ভালো হবে, তা সবার জন্য নাও হতে পারে। প্রকৃতি ও এর প্রতিকূল প্রভাবের উপর মানুষের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, তবে আমরা সর্বদা তাদের মোকাবিলা করার জন্য এবং নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সঠিক পদক্ষেপ বেছে নিতে পারি। □

# শীতের প্রস্থান ও বসন্ত আগমনের মধ্যবর্তী ঋতুপরিবর্তন পর্যায়ে স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রয়োজন সঠিক পথ্য

ত্রিয়া সিংহ

বসন্ত ঋতু, যাকে আমরা ঋতুরাজ বলে থাকি, তা প্রায় আমাদের সকলের কাছেই প্রিয়। এই সময় আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। এই ঋতু বদলের জন্য সর্দি, কাশি, জ্বরের আশঙ্কা থাকে, শরীরের হজম ক্ষমতা কিছুটা কমে যায়। বসন্তের এই আরামদায়ক আবহাওয়ায় বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের আধিক্য দেখা যায়। জলবসন্ত-সহ নানা ভাইরাস ঘটিত রোগের সম্ভাবনা বেশি থাকে।



এই সময় আমাদের শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন রাখা প্রয়োজন। দেহে অনাক্রম্যতা অর্থাৎ রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য খাদ্যতালিকায় প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার রাখতে হবে। আমিষাশীদের জন্য মাছ, মাংস, ডিম এবং নিরামিষাশীদের জন্য দুধ, দই, ডাল, ছোলা প্রভৃতি পথ্যে ও আহারে পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতে হবে। এছাড়াও মরসুমি ফল ও সবজি গ্রহণ করা আবশ্যিক। বসন্ত কালের সবচেয়ে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবারের মধ্যে অন্যতম হলো সজনে ফুল ও ডাঁটা। এই সজনে ফুল ও ডাঁটার মধ্যে উপস্থিত রয়েছে ভিটামিন-এ, ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স

এবং বিভিন্ন খনিজ লবণ। পুষ্টিকর খাবার পাশাপাশি এটি মানব শরীরে বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এছাড়াও রয়েছে নিমপাতা, যার একটি উল্লেখযোগ্য ভেষজগুণ রয়েছে। নিমপাতা অ্যান্টিসেপটিক, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টি ইনফ্যামেটরি এবং অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। এই সময় আহারে ও পথ্যে নিমপাতা রাখা অত্যন্ত জরুরি। ঋতুকালীন সবজি যেমন— পেঁপে, পালংশাক, লালশাক, ব্রকলি ইত্যাদি

খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য ভিটামিন সি-যুক্ত ফল যেমন আমলকি, পেয়ারা, কমলালেবু, মৌসমি ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে। বসন্তকালে শরীরে জলাভাব দেখা যায়। তাই শরীর ও ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান করতে হবে। হজম ক্ষমতা কম হওয়ার কারণে কিছু খাবার এড়িয়ে চলতে হবে যেমন— অতিরিক্ত তেল ও মশলা জাতীয় খাবার, অতিরিক্ত চিনি, চকলেট ইত্যাদি। প্রিবায়েটিক ও প্রোবায়োটিক যুক্ত খাবার খেতে হবে। যেমন দই, রসুন, আদা প্রভৃতি যা আমাদের অস্ত্রের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাবে।



ফ ৪ ৩

# বসন্তকালে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে কয়েকটি নিয়ম পালন করলেই হবে

ডাঃ সুশান্ত মিত্র

ঋতু পরিবর্তনের কারণে শীত থেকে বসন্তে চলাটা ঠাণ্ডা থেকে গরমের দিকে আসা। আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের জন্য আমাদের শরীরে বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুদের শরীরে বেশ প্রভাব পড়ে। এর মূল কারণ হলো বাতাসে ভাইরাসের অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠা। আর এই কারণে সংক্রমণের মাত্রাও খুব বাড়ে। এই সংক্রমণের ফলে বয়স্ক ও শিশুদের মধ্যে দেখা দেয় সর্দি, কাশি ও জ্বরের প্রাদুর্ভাব। এই অবস্থায় যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটু কম, তাদের ক্ষেত্রে একটু বেশি অসুবিধা দেখা দেয়। প্রথমে গলায় সংক্রমণ হয়। গলাব্যথাও হতে শুরু করে কারও কারও। বাতাসে ভাসমান ফুলের পরাগের কারণে এই সংক্রমণ ও অ্যালার্জি বেড়ে যায় এই সময়ে। যাদের হাঁপানির প্রবণতা আছে তাদের কাছে এই সময়টা বেশ কষ্টদায়ক হয়ে ওঠে। আর একটি বিষয় হলো, ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ এবং চোখের সংক্রমণও দেখা যায় এই সময়ে। কারও কারও পেটের সমস্যাও শুরু হয়। আবার কারোর শুধুই বমি হতে দেখা যায়।

**কীভাবে রক্ষা করবো নিজেকে?**

মনে রাখতে হবে, তাপমাত্রার ওঠা-নামা যেমন শরীরের উপর প্রভাব ফেলে, তেমনই প্রভাব ফেলে বাতাসে ভাসমান ভাইরাস, যা লুকিয়ে থাকে ধূলিকণা ও পুষ্প পরাগের মাধ্যমে। আমাদের এর থেকে বাঁচতে যা যা করা দরকার আগে তা ঠিকমতো করতে হবে। প্রথমে বুঝে নিতে হবে, এই সময় শরীরে কী কী সমস্যা এবং কী কী থেকে হচ্ছে।

কারণটা যদি নিজে জেনে যাই, তাহলে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে অনেকটাই সহজ হবে।

আবহাওয়ার এই তাপমাত্রার ওঠা-নামার জন্য

জামাকাপড় পরা থেকে ঘরের ভেতরের

তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকতাকে

মিলিয়ে চলার চেষ্টা করতে হবে।

যাদের এই সময়ে সংক্রমণে

আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি

থাকে তাদের বাইরে

বেরগনোর চেষ্টা কম করতে

হবে। ঘরে থাকলে

ঝানালা বন্ধ রাখতে হবে।

বাসে বা ট্রেনে

যাতায়াতের সময় হাওয়া

না লাগানোই ভালো। কারণ

এই সময় সকাল ও সন্ধ্যায়

বাতাস ঠাণ্ডা থাকে। বেলা

বাড়লে তাতে কোনো অসুবিধা

নেই।

এই সময় বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যায়

মুখে মাস্ক পরতে হবে। মনে রাখতে হবে, সবকিছুই

হয় অ্যালার্জি থেকে। সেই অ্যালার্জি থেকে বাঁচতে যত

রকমভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা যায় তা করতে হবে।

শরীর-ঢাকা জামাকাপড় পরতে হবে। শরীরে রোগ প্রতিরোধ

ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যালাপ ডায়েট নিতে হবে। অতিরিক্ত

মশলাযুক্ত খাবার যতটা সম্ভব কম খেতে হবে। প্রতিদিন

সামান্য হলেও ব্যায়াম করতে হবে। নিজে থেকে ও

আশেপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। বেশি করে

জল পান করতে হবে। হাত থেকে সংক্রমণ বেশি ছড়ায়,

তাই খাওয়ার আগে ভালো করে হাত ধোয়াটা খুব জরুরি।

নিজের নাকে-মুখে হাত দিলেও হাত ধুয়ে ফেলতে হবে।

এই নিয়মগুলি পালন করলেই ঋতু পরিবর্তনের এই সময়ে

খুব সহজেই সুস্থ থাকা যাবে।

(লেখক একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)

# আদর্শ পরিবার গঠনে মহিলাদের ভূমিকা

## সুতপা বসাক ভড়

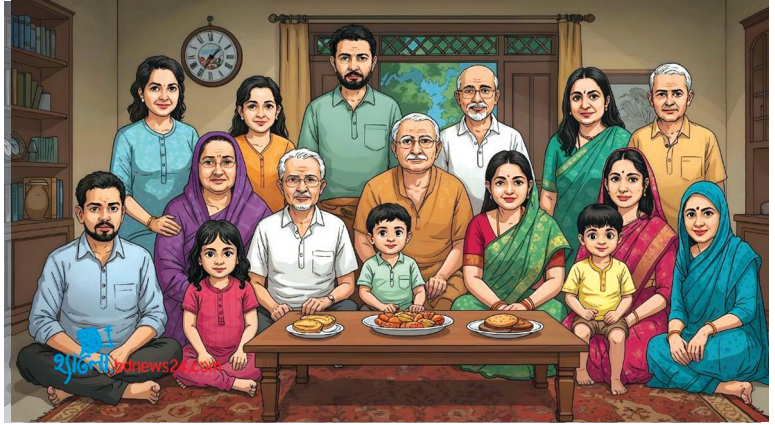
কয়েক দশক আগে পর্যন্ত পরিবার বলতে আমরা মূলত যৌথ পরিবার বুঝতাম। বাংলা সাহিত্যে যৌথ পরিবারের বহু উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তী সময়ে যৌথ পরিবারগুলিতে ভাঙন ধরেছে। এখন সন্তান বলতে একটি বা দুটি। এরা নিয়ে এল বর্তমান সমস্যা— বেশি বয়সে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, বিবাহ না করা, সন্তানাদি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রভৃতি। এই পরিস্থিতি উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, গ্রাম-শহর নির্বিশেষে প্রায় সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে কয়েক দশকের মধ্যেই হয়তো দেখা যাবে, কেবল একজন মানুষ, যার পরিবার নেই। যৌথ পরিবার সঙ্কুচিত হতে হতে এই পরিণতির দিকে যেতে পারে তা অচিস্তনীয়; অথচ মানুষ যে সামাজিক প্রাণী, তার যদি পরিবারই না থাকে, তাহলে সমাজ কীভাবে থাকবে? সংস্কৃতি, পারিবারিক মূল্যবোধ, আগামী প্রজন্ম কীভাবে আসবে? তারা কী শিক্ষা পাবে?

পরিবারের অস্তিত্ব রক্ষা একটি চিন্তার বিষয়। আমাদের পরিবার-পরিচিতির মধ্যে ভাঙন শুরু হয়েছে। কষ্ট পেলেও বিস্মিত হই না। এই ধরনের ঘটনা সমাজে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি হচ্ছে। তবে কী আমরা স্বেচ্ছায় সামাজিক ধ্বংসপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে চলছি না? এই সামাজিক ভাঙনকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে যত্নশীল হতে হবে। এখনও পর্যন্ত আমাদের সমাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক বন্ধন বজায় আছে। তবে বাড়ির বয়স্ক ও ছোটদের প্রতি যথাসম্ভব দায়িত্ববান হতে হবে। অর্থোপার্জননের জন্য আমাদের অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়; কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি যে কতটা ভালোবেসে আমরা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলি? একসঙ্গে সময় কাটাই? একসঙ্গে খেতে বসি? একসঙ্গে গান শুনি? সবাই মিলে একসঙ্গে বেড়াতে যাই? একসঙ্গে পূজায় অংশগ্রহণ করি? বাইরের জগতে বেশি সময় দেওয়া, মোবাইল ফোনে স্যোশাল মিডিয়ায়

হারিয়ে গিয়ে পরিবারকে যেন না হারাই, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। দিনের শেষে, সংকটে সবার আগে পরিবার থাকে আমাদের সঙ্গে, সেজন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়।

অর্থসাম্রায় হবে, সুস্থ ও সমৃদ্ধ পরিবার গঠনে সহায়ক হবে।

বাড়ির প্রত্যেকের ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করা এবং মাঝে-মাঝে সেই বিষয়ে পারিবারিক আলোচনাচক্র অংশগ্রহণ করা একটি ভালো



আমাদের পরিবার ছোটো হতে পারে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে যাতে বন্ধন অটুট থাকে, সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। কর্মসূত্রে পরিবারের ছোটো-বড়ো সদস্যরা দূরে থাকলেও ফোনের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ এবং তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ছোটো ছোটো পারিবারিক দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। পরিবারের ওই বিশেষ কাজ, ওই বিশেষ সদস্যই করবে। এভাবে সকলের মধ্যে পারিবারিক দায়িত্ববোধ ন্যস্ত করা যায়। সকল সদস্য একসঙ্গে থাকুক বা কর্মসূত্রে দূরে থাকুক, মানসিক বন্ধন অটুট রাখা প্রয়োজন। যেকোনো প্রয়োজন, বাড়ির শুভকাজে সবাই যেন একত্রিত হই। মানসিক দূরত্ব কখনোই যেন প্রকট না হয়। পুরানো দিনের কথা, ছবি দেখা, হাসিগল্প, প্রিয় খাবার রান্না করা, বিশেষ তিথি পালন, সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে মন্দিরে যাওয়া অভ্যাসের মধ্যে আনতে হবে। প্রত্যেক সদস্য যেন নিজেকে সুরক্ষিত অনুভব করেন। সামাজিক মাধ্যমগুলিতে আসক্ত না হয়ে সুস্থ জীবনশৈলী অনুসরণ করা প্রয়োজন। বাড়ির পারস্পরিক খাবারের ওপর জোর দিতে হবে। এতে

অভ্যাস। প্রত্যেকের নিজস্ব শখ থাকবে, এমনটাই স্বাভাবিক। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের শখের বিষয় মতামত আদান-প্রদান করলে সামগ্রিকভাবে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞানবর্ধন হয়। সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার সময় ব্যক্তিগতভাবে নয়, পারিবারিকভাবে একটি প্রভাবশালী, প্রতিষ্ঠিত পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এছাড়া, তুলভ্রান্তি মিটিয়ে নেবার জন্য পরিবারের সকল সদস্যদের ইতিবাচক ভূমিকা বাঞ্ছনীয়; তবেই আমরা একটি সুখী, আনন্দিত এবং আদর্শ পরিবার গঠনের কাজে অগ্রসর হতে পারব। এই কাজে পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা অবশ্যই কাম্য। বাড়ির মহিলারা থাকেন কেন্দ্রে। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিটি পরিবার হয়ে উঠতে পারে আদর্শ পরিবার। এর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা ঈশ্বর ভারতীয় মহিলাদের দিয়েছেন, তার জুড়ি মেলা ভার। মনে রাখতে হবে পরিবার হলো আমাদের সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের একক, 'বিরিট'-এর একটি ক্ষুদ্র অথচ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। □

‘বসন্ত এসে গেছে’ এই শব্দ বন্ধ কানে এলেই মনে একটা পুলক জাগে, হর্ষ অনুভব হয়। আমরা বাঙ্গালিরা সাধারণত খুব বেশি শীত সহ্য করতে অভ্যস্ত নই। তাই শীতের শেষে বসন্ত এলেই মেজাজ যেন একটু ফুরফুরে হয়ে যায়। ফলত ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টাকে আমরা অবহেলা করি আর এই অবহেলার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে নানান রোগের কারণ। এ সময় সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট, এলার্জি, ভাইরাল ফিভার, ব্রঙ্কাইটিস ও ত্বকের সমস্যা বেড়ে যায়। বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা এই সময়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। বৃদ্ধরা যাঁরা COPD

(chronic obstructive pulmonary disease) রোগে ভোগেন তাদের সমস্যা বেশি হয়। আবার বৃদ্ধ ও শিশুদের যেহেতু রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কম তাই, তারা এই সময়ে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বসন্তকালে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে জলবসন্ত (Chickenpox), হাম, চোখ ওঠার (Conjunctivitis) মতো রোগগুলো বেশি ছড়ায়। এ সময় ধুলোবালি ও পুষ্পরেণুর কারণেও হাঁপানি, ত্বকের সংক্রমণ এবং পেটের সমস্যাও (Gastroenteritis) দেখা দিতে পারে।

#### প্রতিরোধ :

আমরা অল্পবিস্তর সকলেই জানি prevention is better than cure, তাই রোগ প্রতিরোধ করতে পারলে রোগ ভোগা স্তি কম হয়। যেমন এ সময় দিনে গরম আবার রাতে ঠাণ্ডা, তাই দিনের বেলা এবং সন্ধ্যা বা রাত্রিতে পোশাক বিধি আবহাওয়ার উপযোগী হওয়া চাই। বসন্তকালে শারীরিক নানা জটিলতার জন্য কিছু অনুঘটকও রয়েছে। বসন্তে পুষ্পরেণু অ্যালার্জি সাধারণ ঘটনা। শুষ্ক হাওয়ায় ধুলোবালি থেকেও অ্যালার্জির সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম হলো হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে কাঁচা জল পড়া, চোখ চুলকানো ও চোখ লাল হয়ে যাওয়া। তাই যাঁদের অ্যালার্জির প্রবণতা আছে, তাঁদের এই সময়টা সাবধানে থাকতে হবে। অ্যালার্জিজনিত এসব সমস্যা এড়াতে মুখে মাস্ক ব্যবহার করলে কিছুটা রোগ প্রতিরোধ করা যায়। বাইরে থেকে ঘুরে এসে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবে খাবারে হাত দেওয়া



## বসন্তকালীন রোগ নিরাময়ে হোমিওপ্যাথির ভূমিকা

ডাঃ বলরাম পাল

উচিত। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল পান করুন। মরসুমি শাকসবজি, ফল সেবনেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে থাকে। হালকা ব্যায়াম, আসন, প্রাণায়াম করলেও ভালো থাকা যায়। বাড়িতে যদি কারও হাঁচি, সর্দি, কাশি, জ্বর হয় সেক্ষেত্রে একটু দূরত্ব বজায় রাখা প্রয়োজন।

#### চিকিৎসা :

সাধারণত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম, কারণ এই চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে স্বপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। যদিও এই চিকিৎসা পদ্ধতি খুবই সহজ লভ্য তথাপি এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ওষুধ নির্বাচন করতে যথেষ্ট মুনশিয়ানার দরকার হয়। আবার ওষুধ

নির্বাচন করলেই হবে না, দরকার সঠিক পোটেন্সি নির্বাচন। কতক্ষণ অন্তর কতবার ওষুধ সেবন করতে হবে সেটাও বুঝতে হবে।

#### কার্যকরী হোমিওপ্যাথিক ওষুধ :

- হাঁচি নামে কাঁচা জল সর্দি কাশি : Aconite, Allium, Cepa, Bryonia, Dulcamara, Justicia Ad. Ocimam Sanc, Rhus Tox.
  - জ্বর গা হাত পায়ে ব্যথা : Aconite, Bryonia Dulcamara, Eupatproim Perf. Influenzinum।
  - হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট : Aspidosperma, Blata Ori, Carbo Veg, Heper Sulph, Kali Mur, Spongia।
  - এলার্জিজনিত সমস্যা : Arsenic Album, Belladonna, Dulcamara, Rhus Tox।
  - চোখ ওঠা বা Conjunctivitis-Euphrasia, Dulcamara, Rhus Tox।
  - হাম ও জলবসন্ত (Chickenpox)-Gelsemium, Malandrinum, Rhus Tox।
  - পেটের সমস্যা : Carbo Veg. Dulcamara, Nux Vomica, Pulsatilla।
- পরিশেষে বলি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে miracle করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া জরুরি।



## ঋতু পরিবর্তনের সময় যোগানুশীলনের সুফল

ভাস্কর গোস্বামী

ঋতু পরিবর্তনের সময় আমাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কিছুটা হলেও কমে যায়। বর্তমান জলবায়ু পরিস্থিতিতে ভারতে ছয়টি ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের প্রভাবটা বেশি দেখা যায়। প্রতিটি ঋতুরই কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যে কারণে আমাদের শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

যোগব্যায়াম, শ্বাস-প্রশ্বাসের অভ্যাসের মাধ্যমে ঋতু অনুযায়ী যোগাসন (যেমন— শীতে উষ্ণতা, গরমে শীতলতা) ও শ্বাস-প্রশ্বাসের বিভিন্ন ব্যায়াম মানব শরীরকে নতুন আবহাওয়া বা তাপমাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে, যা রোগ প্রতিরোধ করে শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্য বজায় রাখে।

এখন ঋতু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শীতের পর বসন্ত হলো কফ দোষের ক্ষেত্র, যার মধ্যে ভারী মাথা, ঠাণ্ডা লাগা এবং আঠালো কফ জমে যাওয়ার মতো উপসর্গ রয়েছে। আর আয়ুর্বেদ বলে যে আমাদের বিপরীত গুণাবলীর সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

মাথা ভারী ভাব ও ঠাণ্ডা প্রতিরোধের জন্য আমাদের অবশ্যই এমন জীবনচর্যা গ্রহণ করতে হবে যাতে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা রোধ করা যায়। যদি আমরা বসন্তে বিপরীত গুণাবলী (adverse effects) প্রতিরোধ না করি, তাহলে আমাদের সর্দি-কাশি, সাইনাস বা বুকো রক্ত জমাট বাঁধা, পা গোড়ালি বা হাতের চারপাশে তরল জমা এবং চোখ ফুলে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

ভারসাম্যহীনতার কারণে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধের জন্য ঋতুসন্ধির (দুই ঋতুর মধ্যবর্তী ক্রান্তিকাল, অর্থাৎ একটি ঋতুর শেষ সাত দিন এবং পরবর্তী ঋতুর প্রথম সাত দিন) সময়ের

১৪ দিনের মধ্যে খাদ্য ও জীবনচর্যায় ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দ্বারা শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে আয়ুর্বেদ।

ঋতু পরিবর্তনের সময় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে বেশ কিছু উপায়।

**শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ :** প্রাণায়ামের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করলে ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ে, যা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। শীতকালে শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখতে এবং অস্থিসন্ধির ব্যথা কমাতে কপালভাতি ও ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম উপকারী, যা শরীরকে উষ্ণ রাখে। গ্রীষ্মকালে শরীরকে ঠাণ্ডা ও শান্ত রাখতে চন্দ্রভেদন প্রাণায়াম, শীতলী ও শীতকারী প্রাণায়াম অত্যন্ত কার্যকর।

**রক্ত সঞ্চালন :** যোগাসনের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়, পেশি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অক্সিজেন পৌঁছায়।

বর্ষাকালে আর্দ্রতা ও ক্লান্তি দূর করতে এবং হজমশক্তি বাড়াতে যোগব্যায়াম শরীরকে সতেজ ও কর্মক্ষম রাখতে সাহায্য করে।

**স্ট্রেস কমান্বয় :** ধ্যান ও জপ স্ট্রেস কমাতে সাহায্য করে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়াও নিজের ইচ্ছাশক্তিকে আর সক্রিয় করে তুলে দেহের বিষাক্ত পদার্থ দূর করে ষট্‌কর্ম ক্রিয়া। দেহের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে এই ক্রিয়া। (সংস্কৃত ভাষায়, ষট্‌ শব্দের অর্থ ‘ছয়’ এবং ক্রিয়া শব্দের অর্থ ‘ক্রিয়াকলাপ’, যার আক্ষরিক অর্থ ছয়টি কার্যকলাপ। হঠযোগ প্রদীপিকা অনুসারে, ছয়টি যৌগিক শুদ্ধিকরণ অনুশীলন হলো ষট্‌কর্ম ক্রিয়া।)

**কিছু উপকারী আসন :**

সূর্য নমস্কার, ভূজঙ্গাসন, অর্ধচক্রাসন, শবাসন (শিথিল

হতে), মার্জারাসন, অর্ধ চক্রাসন, উত্তানাসন, বৃক্ষাসন, শিশু আসন।

**প্রাকৃতিক ভাবে শীত ও বসন্তের ঋতুসন্ধির সময় SDA-এর গুরুত্ব :**

শীত ও বসন্তের মাঝে বিশ্বের অনেক জায়গায় আবহাওয়া ঠাণ্ডা, অন্ধকার, সাঁাতসেঁতে আবহাওয়ার ফলে ঠাণ্ডা মাসগুলি অনেকের শরীরে একটা শীতকালীন নীলাভ ভাব নিয়ে আসে, যা সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার (SAD) নামেও পরিচিত। শীতের আবহাওয়ায় সূর্যের আলো হ্রাস পেলে এসব ঘটে।

SAD (সিজনাল অ্যাফেক্টিভ ডিসঅর্ডার ১৯৮৪ সালে স্বীকৃত হয়েছিল, বর্তমানে এটি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত) এক ধরনের মরসুমি বিষণ্ণতা যা প্রায়শই শীতের মধ্যে শুরু হয় এবং বসন্ত ও গ্রীষ্মে হ্রাস পায়। যদিও SAD-এর তীব্রতা কাউকে প্রভাবিত করে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে, বিশ্বের যেসব অঞ্চলে শীতের মাসগুলিতে অত্যন্ত কম পরিমাণে সূর্যালোক পাওয়া যায়, যেমন সিয়াটল, ওয়াশিংটন ও আলাস্কার কিছু অংশে বসবাসকারী মানুষের জন্য SAD একটি সাধারণ ঘটনা হতে পারে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু অনুযায়ী এটা সঠিকভাবে মোকাবিলা যেতে পারে।

**বসন্তকালে SAD-এর লক্ষণ :**

অনিদ্রা।

ক্ষুধাহীনতা, খাওয়ার প্রতি অনীহা।

ওজন বেড়ে যাওয়া।

পেটে বায়ুর প্রভাব বেশি।

উদ্বেজনা ও উদ্বেগ।

বিষণ্ণতা, কম শক্তি ও মনোনিবেশ করতে অসুবিধা।

উপরোক্ত সমস্ত রকম উপায় যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম, যট্‌কর্ম ক্রিয়া, ধ্যান ও জপ এক্ষেত্রেও কার্যকর। ঋতুচক্র যাই হোক না কেন, এই লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে। এই ঋতুগত ব্যাঘাতের উৎস হলো মানুষের সার্ক্যাডিয়ান ছন্দের ব্যাঘাত যা শরীরে সেরোটোনিন ও মেলাটোনিনের মাত্রা পরিবর্তন করে। ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা মধ্যে রয়েছে আয়ুর্বেদ টোটকা, হালকা থেরাপি ও সাইকোথেরাপি।

ঋতু পরিবর্তনকালীন পর্যায়ে আয়ুর্বেদ অনুসারে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন প্রয়োজন। শীতের শেষে ও বসন্তের শুরুতে শরীরে জমে থাকা কফ ও টক্সিন বের করতে হালকা উষ্ণ ও তেতো, ঝাল বা কষা স্বাদের খাবার অপরিহার্য। এই সময় হজমশক্তি কিছুটা কমে, তাই তেল-চর্বিহীন, সহজে হজমযোগ্য এবং তাজা খাবার যেমন বার্লি, মধু, আদা-রসুন, মরসুমি শাকসবজি খাওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া টক দইয়ের ঘোল বিশেষ উপকারী। এই সময় আরও বিশেষভাবে উপযোগী খাদ্য হলো নিমপাতা। বাংলা ফাল্গুন-চৈত্র মাসে শরীরকে ডিটক্সিফাই

বা বিষমুক্ত করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে নিমপাতা অত্যন্ত উপকারী। এটি রক্ত পরিষ্কার করে, শীতকালীন জমে থাকা কফ ও ত্বকজনিত সমস্যা দূর করে এবং বসন্তের সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

**ব্যবহারের নিয়ম :**

সকালে খালি পেটে ২-৩টি কচি নিমপাতা চিবিয়ে খেলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়। এছাড়াও যে চিরাচরিত পদ্ধতিতে তেল দিয়ে নিম বেগুন ভেজে খাওয়া হয় সেটিও খারাপ নয়, তবে অবশ্যই কম তেল দিয়ে ভাজতে পারলে ভালো, অথবা তেল ছাড়া শুকনো খোলায় ভেজে গরম ভাতের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে।

শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার এবং বিষাক্ত পদার্থ দূর করে শরীর ও মনকে শুদ্ধ করার ছ'টি বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া নিম্নরূপ/:

১. নেতি : ন্যাসাল প্যাসেজ বা নাসারন্ধ্র পরিষ্কার করার প্রক্রিয়া (জল বা সূত্র নেতি)।

২. ধৌতি : পাকস্থলী ও খাদ্যনালী পরিষ্কার করা।

৩. নৌলি : পেটের পেশী সঞ্চালনের মাধ্যমে অন্ত্র ও পাকস্থলীর ম্যাসেজ।

৪. বস্তি : অন্ত্র বা কোলন পরিষ্কার করার যৌগিক পদ্ধতি (এনিমা)।

৫. কপালভাতি : দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুস ও মস্তিষ্ক পরিষ্কার।

৬. ট্রাটক : মোমবাতি বা কোনো বিন্দুতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ পরিষ্কার ও মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করা।

এই প্রক্রিয়াগুলো শরীরের মেদ ও শ্লেষ্মা কমিয়ে হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। শরীরের বিভিন্ন দোষ (বাত, পিত্ত, কফ) ভারসাম্যপূর্ণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। অতিরিক্ত মেদ ও ওজন কমাতে সাহায্য করে।

**আয়ুর্বেদিক উপায় :** রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে চ্যবনপ্রাশ, গিলয় (গুলঞ্চ), অশ্বগন্ধা, তুলসী ও আমলকি অত্যন্ত কার্যকরী আয়ুর্বেদিক ভেষজ। প্রতিদিন সকালে ১ চামচ চ্যবনপ্রাশ, গিলয় জুস বা হলুদ মেশানো গরম দুধ সেবন করলে শরীর সতেজ থাকে, সংক্রমণ প্রতিরোধ হয় এবং কফজনিত সমস্যা কমে। মরসুমি শাকসবজি ও ফল গ্রহণ করতে হবে।

**গণ্ডুষ কর্ম বা অয়েল পুলিং :** সকালে তেল দিয়ে কুলকুচি করা শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

আয়ুর্বেদ মতে, এই সময়ে হালকা খাবার খাওয়া বা মাঝেমধ্যে উপবাস ডি-টক্সিফিকেশনে সহায়ক। এই সমস্ত পদ্ধতিগুলিই ঋতু পরিবর্তনের সময়ে শরীরকে সুস্থ রাখে।



## বীরসা মুণ্ডা গ্রাম বিকাশ পুঞ্জ -এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত তিন বছর ধরে বাঁকুড়া জেলায় সারেঙ্গা ও রাইপুর খণ্ডে ১৩টি গ্রামে ‘কর্মযোগী’র সহযোগিতায় ও বীরসা মুণ্ডা গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের পরিচালনায় ১৩টি শিশু সংস্কার কেন্দ্র ও একটি পাঠদান কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত গ্রামের মা-বোনেরা নিঃস্বার্থ সেবার মাধ্যমে তাঁদের গ্রামের শিশুদের নিজ সন্তান স্নেহে শিক্ষাদান করে চলেছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি পেঁচাকলা ফুটবল মাঠে আয়োজিত হয় বীরসা মুণ্ডা গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের বার্ষিক অনুষ্ঠান। এদিন দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠান, সুভাষিতম্, যোগব্যায়াম, যোগাসন, সূর্য নমস্কার ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-সহ আয়োজিত হয় জনজাতি নৃত্যানুষ্ঠান এবং ‘বন্দে মাতরম্’ সংগীতের সার্থশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ‘বন্দে মাতরম্’ নৃত্যানুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে একত্রে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে ভারতমাতার পূজার প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে ২২০ জন শিশু, ৮২ জন অভিভাবক ও ৩৭ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠদান কেন্দ্রের দিদিভাই শ্রীমতী সুস্মিতা সন্নিগ্রাহী। ‘কর্মযোগী’র আদর্শ ব্যাখ্যা করে শিশু ভাই-বোনদের আশীর্বচন দান করেন এদিনের অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি মধ্যবঙ্গ গ্রাম বিকাশ টোলীর সদস্য সনৎ কুমার বসু মল্লিক। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সম্বন্ধের দক্ষিণ বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সঞ্চালক অশোক কুমার গোপ, উত্তর বাঁকুড়া জেলা কার্যবাহ হৃদয় নাথ প্রামাণিক, গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের সভাপতি শুভেন্দু সন্নিগ্রাহী, কর্মযোগী সেবা ট্রাস্টের সভাপতি ও সম্পাদক— নারায়ণ মণ্ডল ও সুরত দত্ত এবং বিধানচন্দ্র আকুলী। গ্রাম বিকাশ পুঞ্জের এই সেবাকাঙ্গে উৎসাহিত হয়ে দুর্গাপুর আইকিউ সিটি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু, বিশিষ্ট নিউরো সার্জন ডাঃ হার্দিক রাজগুরু সবক’টি কেন্দ্রের ২২০ জন শিশুকে সুন্দর স্কুল ব্যাগ উপহার দিয়েছেন। বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। কল্যাণ মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

## বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে সন্ত রবিদাস জয়ন্তী উদযাপন

গত ৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ‘সামাজিক সমরসতা অভিযান’-এর উদ্যোগে উদযাপিত হলো সন্ত রবিদাস জয়ন্তী। উত্তর কলকাতা-স্থিত পরিষদের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয়ে সুন্দর পরিবেশে সন্ত রবিদাসজীর প্রতিকৃতিতে মালাদান, পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী শ্রীসোহনজী সোলঙ্কি ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী মানিকচন্দ্র পাল। সন্ত রবিদাসজীর জীবন, সামাজিক সমরসতার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এবং দেশজুড়ে সামাজিক সমরসতা রক্ষায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কার্যকলাপ, সমাজে সমরসভাব জাগরণে পরিষদের কার্যকর্তাদের কী করণীয় সেই বিষয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন পরিষদের কলকাতা ক্ষেত্র

সামাজিক সমরসতা প্রমুখ গৌতম সরকার। গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের অনেক স্থানে সন্ত রবিদাস জয়ন্তী উদযাপিত হয়। গত ১ ফেব্রুয়ারি বিধাননগর-স্থিত পূর্বাঞ্চলীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হিন্দু সম্মেলনেও সন্ত রবিদাসজীর জীবন এবং সমরস সমাজ নির্মাণে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ভূমিকার বিষয়টি আলোচিত হয়।





## হাওড়ায় শিবপুরে 'স্বস্তিকা'র পাঠক সম্মেলন

গত ৮ ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী স্মৃতিরক্ষা সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া মহানগরের 'স্বস্তিকা'র পাঠক সম্মেলন। এদিনের সম্মেলনে বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'র সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল এবং মুখ্য ব্যবস্থাপক জয়রাম মণ্ডল। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের সূচনা করেন আনন্দবাজার পত্রিকার পূর্বতন সাংবাদিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগরের পূর্বতন সঞ্চালক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনের সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দান করেন জয়রাম মণ্ডল। তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সাল থেকে ৭৮ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে এগিয়ে চলেছে স্বস্তিকা। একনাথ রাণাডে, রণদেব চৌধুরী, ভবেন্দু ভট্টাচার্য্যাদের নিরলস পরিশ্রমের কথা তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে স্মরণ করেন। তিনি বলেন যে, স্বস্তিকা কোনো কমাশিয়াল পত্রিকা নয়, তাই বিভিন্ন স্টল বা হকারের মাধ্যমে স্বস্তিকার পাঠক সংখ্যাবৃদ্ধি

সম্ভব নয়। এই পত্রিকাটির প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব প্রচার-প্রতিনিধি ও স্বয়ংসেবকদেরই নিতে হবে। হাওড়া পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১০ জন স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহক করার জন্য তিনি সকলকে উৎসাহিত করেন। ১৮৩৫ সাল থেকে মেকলীয় ব্যবস্থার দ্বারা যে পদ্ধতিতে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসকে চেপে রেখে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া চলছে, যে প্রক্রিয়ায় এক শ্রেণীর ভারতীয়দের বাদামি চামড়ার সাহেবে পরিণত করা চলছে— সেই বিষয়টি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। তিনি বলেন যে, ভারতের 'স্ব' বা নিজস্বতাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস করে যাচ্ছে স্বস্তিকা। স্বদেশ, স্বজাতি ও বাংলা ভাষাকে সম্মতিময় প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে স্বস্তিকা। স্বস্তিকার প্রচার ও প্রসারের জন্য সম্মেলনে উপস্থিত প্রচার-প্রতিনিধি ও স্বস্তিকার পাঠকরা তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ দান করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বস্তিকার প্রচার প্রতিনিধি মলয় গড়াই। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকার আর এক প্রচার প্রতিনিধি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়।

## হাতিয়াড়ায় হিন্দু সম্মেলন ও সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ

গত ২৫ জানুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হাতিয়াড়া নিকুঞ্জ সেন নগরে হিন্দু সম্মেলন সমিতির উদ্যোগে চাঁদপুর পালপাড়া শীতলামন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় বিশাল হিন্দু সম্মেলন ও গীতাপাঠ অনুষ্ঠান। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জলাহারী বাবা আশ্রমের অধ্যক্ষ পরশুরাম বাবা, মহানির্বাণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সর্বানন্দজী মহারাজ, ধর্ম জাগরণ সমন্বয়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-সংযোজক রতন চক্রবর্তী, হিন্দু জাগরণ



মঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত টোলীর সদস্য রোহিত সাউ, প্রিয়াঙ্কা টিকাদার-সহ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এবং বহু সাধুসন্ত। এদিনের হিন্দু সম্মেলনে সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ-সহ দেশাত্মবোধক ও ধর্মীয় সংগীতানুষ্ঠান এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন শেষে সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।



## মুরারীপুরে ছতাত্মা স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলের স্মৃতিতর্পণ

গত ১০,১১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদহ বিভাগ ও দিনাজপুর বিভাগের প্রচারক বৈঠক বালুরঘাট নগরে সঙ্ঘ কার্যালয় পাঞ্চজন্য ভবনে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সমাপ্তির পর হিলিতে বাংলাদেশ সীমান্ত দর্শনের আগে হিলি খণ্ডের মুরারীপুর গ্রামের সঙ্ঘের শাখায় সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর আক্রমণে নিহত স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলের স্মৃতিসৌধের সামনে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়-সহ অন্যান্য প্রচারকরা পৌঁছান। ১৯৮৪ সালের ১৬ মার্চ দিনটিতে ঘটে যাওয়া সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী, স্থানীয়

স্বয়ংসেবকরা এদিন বর্ণনা করেন। স্মৃতিসৌধে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ এবং সঙ্ঘ প্রার্থনার মাধ্যমে উপস্থিত সকলে ছতাত্মা প্রশান্ত মণ্ডলের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তাঁর আত্মোৎসর্গের সঙ্গে সঙ্ঘকাজে বলিদান হওয়া স্বয়ংসেবক ছতাত্মা চুরকা মুরুর স্মৃতির উদ্দেশেও এদিন শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। স্বয়ংসেবক প্রশান্ত মণ্ডলের স্মৃতিকে সামনে রেখে নিত্য শাখা ও মিলন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান সঙ্ঘ প্রচারকরা। সেই সঙ্গে প্রশান্ত মণ্ডলের বলিদানকে স্মরণ করার জন্য সেবাকাজ এবং স্মৃতিসৌধের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০ হাজার টাকা তাঁরা প্রদান করেন এবং আগামীদিনেও সবরকম সহযোগিতার বিষয়ে ঘোষণা করেন।

## কারাগারে স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের স্মরণ দিবস উদযাপন

গত ৩০ জানুয়ারি বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি ও চট্টগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার ও আলিপুর সেন্ট্রাল জেল মিউজিয়ামে ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের স্মরণ দিবস উদযাপিত হয়। এরই সঙ্গে এদিন মহাজাতি সদন ও প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে উদযাপিত হয় বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ১৩৭তম জন্মদিবস। এদিন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক ড. রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তথা বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস, বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র অমল মুখোপাধ্যায়, অমলবাবুর সহধর্মিণী মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী তারকেশ্বর সেনগুপ্তর ভ্রাতৃপুত্র পরিমল সেনগুপ্ত, বিপ্লবতীর্থ চন্দননগর ও চন্দননগর ইয়ং মেন কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনিল কুমার ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বিপ্লবীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও



পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ওড়িশা থেকে আগত ১২ জন বিশিষ্ট অতিথি এদিন আত্মবলিদানকারী বিপ্লবীদের স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।



## কলকাতা বইমেলায় নেতাজী বিষয়ক ক্যালেন্ডার ও পুস্তক প্রকাশ

গত ২৮ জানুয়ারি বিধাননগরে সেন্ট্রাল পার্কে আয়োজিত ৪৯তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় প্রেস কর্নারে এশিয়ান পাবলিকেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হলো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিষয়ক ক্যালেন্ডার ও পুস্তক প্রকাশ অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন আইএএস আধিকারিক দেবশিস সেন, বিপ্লবী পরীক্ষিত্ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক ও লেখক সৈকত নিয়োগী, সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত এবং এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এশিয়ান পাবলিকেশনের পক্ষ থেকে মৃত্যুঞ্জয় দিন্দা। তাইহোকুতে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু যে একটি ডাহা মিথ্যে কাহিনি— সেই বিষয়টি তুলে ধরতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিরা ‘There is no record of any plane crash! : Taiwan Report’-শীর্ষক একটি ক্যালেন্ডারের আবরণ উন্মোচন করেন। এই তাইওয়ান রিপোর্ট ক্যালেন্ডারটিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র-সহ পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁরা হলেন— ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট নেতাজী অনুগামী ও প্রাক্তন সাংসদ মুথুরামালিপ্পম থেবর, বিশিষ্ট নেতাজী অনুগামী ও প্রাক্তন



সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ, বিশিষ্ট সাংবাদিক বরণ সেনগুপ্ত ও সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মনোজ কুমার মুখোপাধ্যায়। তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনাকে মিথ্যা বলে

তাঁদের করা উক্তিসমূহ-সংবলিত এই ক্যালেন্ডারটিতে প্রদর্শিত হয়েছে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার বিষয়ে তাইওয়ান সরকারে তদন্ত রিপোর্ট। এছাড়াও, এদিন প্রকাশিত হয়—সৈকত নিয়োগী ও সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত সংকলিত গ্রন্থ— ‘সুভাষ রচনা সংকলন (তৃতীয় খণ্ড)’, ‘সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতাদর্শ’, ‘অগ্নিযুগ গ্রন্থ সংকলন’; বিপ্লবী মোতিলাল রায় রচিত ‘আমার দেখা বিপ্লবী ও বিপ্লবী’; শিবসাধন দে রচিত ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে হাওড়া’; দেবশিস সেন রচিত ‘এক ডজন ভ্রমণ’ এবং বিবেক গুহ ও চন্দন দাশশর্মা সংকলিত রবীন্দ্র সংগীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস স্মারকগ্রন্থ— ‘জর্জ বিশ্বাস - ব্যক্তিমানস ও স্মৃতিচারণ’। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন লেখক সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত।

মুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের  
অত্যাধুনিক গয়নার  
ডিজাইনের ক্যাটালগ  
**সুপার**  
যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন  
ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন  
**9830950831**

Today's Choice.....  
**Vandana**  
SAREES • SUITS • BEDSHEETS  
Mfg. of Cotton Printed & Embroidery  
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)  
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475



## মহাজাতি সদনে বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ৬ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পদধূলিধন্য পবিত্র তীর্থভূমি মহাজাতি সদনে উদ্‌যাপিত হলো বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ১৩২তম জন্মদিবস। বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতের বড়োলাট হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রায় বোমা নিক্ষেপ করে তাকে গুরুতর আহত করার দায়ে ফাঁসি হয় বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত এই বিপ্লবীর জন্মদিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জ্বল বিশ্বাস, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হরেন বাগচী বিশ্বাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসুর দৌহিত্র অভিজিৎ রায়, রাসবিহারী বসু রিসার্চ

ব্যুরোর সম্পাদক তপন ভট্টাচার্য, বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সম্পাদক গোপাল চক্রবর্তী, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত, দ্য বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কার্যকরী সভাপতি বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত, নব ব্যারাকপুর নেতাজী জন্মজয়ন্তী কমিটির সত্যব্রত সোম, ডাঃ সুরত ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তথা বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পৌত্র তরুণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের অসামান্য অবদানের কথা বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন।

## সুন্দরবন অঞ্চলে পাঁচশত কণ্ঠে গীতাপাঠ এবং মন্দিরের ভূমি পূজন

গত ১ ফেব্রুয়ারি মাঘী পূর্ণিমার শুভ লগ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সুন্দরবন অঞ্চলে চণ্ডীপুরে মন্মথনগর গ্রামে ধর্ম জাগরণ সমন্বয়, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো একটি আশ্রম ও মন্দিরের ভূমি পূজন। এই স্থানে আশ্রম ও মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে অসহায় মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দানের উদ্দেশ্যে নির্মিত হবে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। প্রকল্পটি রূপায়িত হলে স্থানীয়রা উপকৃত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জমিটি দান করেছেন স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ। সমগ্র প্রকল্পটির রূপায়ণের দায়িত্বে থাকা 'সুন্দরবন রুরাল ডেভেলপমেন্ট চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'-এর অন্যতম ট্রাস্টি নূপুর ভট্টাচার্যের হাতে এদিন জমির দানপত্রটি তুলে দেন পূজনীয় মহারাজ। এদিন ভূমি পূজন করেন ভোলা গিরি আশ্রমের সন্ন্যাসী স্বামী ধ্যানব্রতানন্দগিরি মহারাজ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী প্রকাশ ব্রহ্মচারী। ভূমি পূজনের পর সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মানুষদের প্রায় ৫০০ গীতা দান করা হয়। ভূমি পূজনের সঙ্গে এদিন শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হয় এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।





# SURYA FOUNDATION

B-3/330, Paschim Vihar, New Delhi - 110063. Tel. : 011-25251588, 25253681  
Email : [interview@suryafoundation.org](mailto:interview@suryafoundation.org) Website : [www.suryafoundation.org](http://www.suryafoundation.org)

Surya Foundation is a prestigious organization dedicated to the overall development and training of youth. Our primary objective is to cultivate bright, dedicated and determined youth who are committed to the nation and capable of fulfilling various responsibilities and to engage them in social service. We require young men who have grown up with the values of the Sangh, are interested in social work and are physically fit. Interested applicants can apply for the categories listed below. Selected candidates will have to undergo an interview process.

After selection in the interview, necessary training will be provided. Following this, On Job Training (OJT) will be provided for one year in the service projects run by Surya Foundation. After the OJT, the stipend will be revised and remuneration will be provided based on performance.

Category	Experience	Age Between	3 months Initial Training + 1 year OJT Stipend
Under Graduate, Graduate & Post Graduate	B.Sc. BCA, BBA, BA, B.Com (Pursuing / Passed)	18-25	1.5 - 2 L Per Annum
	B.Com. with three years experience in accounts, purchase, store	18-28	3.6 L Per Annum
	B.Ed., MSW, M.A. (Freshers / Experience*)	18-25	2.4 - 3 L Per Annum
	MCA, M.Ed., M.Sc., M.Com. (Freshers / Experience*) Ph.D. *	18-25	3 - 3.6 L Per Annum
	Mass Communication (Media) - PG	18-28	2.4 - 3 L Per Annum
	Diploma (Multi Media, Electrical, Electronics ++)	18-25	1.8 - 3 L Per Annum
Engineers, (Fresher & Experienced)	B.Tech	22-30	3.6 - 4 L Per Annum
	M.Tech	22-30	4.2 - 4.5 L Per Annum
MBA (Fresher & Experienced)	MBA	22-30	3 - 3.6 L Per Annum
Law	LLB	22-28	2.4 - 3 L Per Annum
	LLM	22-28	3 - 3.6 L Per Annum
CA	IPCC / MTER	18-25	4 - 5 L Per Annum
	Fresher / Experienced*	22-30	6 L Per Annum Onwards
GMT	Graduate Management Trainee	Description given hereunder @	

@ **GMT Eligibility:** Students who will pass their 10th, 11th, or 12th grade exams in 2026 can apply. Applicants must have secured a minimum of 60% marks in the previous class and 75% marks in Mathematics. **Age:** Below 18 years. After 6 months of initial training at Surya Training Center, candidates will be sent for On Job Training (OJT). Along with OJT, facilities for pursuing Graduation and MBA/MCA will be provided. During the initial 6 months of training, food and accommodation will be provided free of charge, along with a scholarship of ₹6,000 per month. During On Job Training, along with accommodation and education, a stipend of ₹8,000 in 11th grade, ₹10,000 in 12th grade, ₹13,000 in the first year of Graduation, ₹16,000 in the second year, ₹20,000 in the third year, ₹23,000 in the first year of MBA/MCA, and ₹28,000 in the second year of MBA/MCA will be provided per month. After completion of MBA/MCA, a salary/remuneration of ₹40,000 per month will be given, which may be higher based on work performance.

\* **Salary of Ph.D. & experienced candidates will be determined based on their qualifications and experience.**

Please fill out and submit the application form in Hindi or English only. Along with your detailed resume, please mention if you have participated in any camps such as the RSS training camp/Prathmik Shiksha Varg (ITC)/Sheet Shivir/NCC/NSS etc. Also, mention if you have been associated with any school/hostel of Seva Bharati/Vidya Bharati/Vanvasi Kalyan Ashram, or any other organization, and if so, when and how. If you know anyone in the Surya family, please include their name and department. While providing details of your education, please attach a photocopy of your mark sheet.

**Please send your application along with a detailed resume to the address mentioned above. Applications can also be sent via email.**

Last date for Application : April 30, 2026

# স্বামীজীর আলোকে নেতাজীর রাষ্ট্র ভাবনা

সন্দীপ কুমার সিনহা

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে পটুভী সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে সুভাষচন্দ্র বসু যখন পুনরায় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন গান্ধীজী লিখলেন, ‘আসলে এ আমারই পরাজয়। কেননা পটুভীকে যোগ্যতর মনে করে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার পরাজয়ে আমি আনন্দিত। কেননা আজ স্পষ্ট হলো অধিকাংশ কংগ্রেস প্রতিনিধি আমার নীতি ও পদ্ধতি পছন্দ করে না।’ তারপরে স্বগতোক্তি : ‘সুভাষ বোস, আর যাই হোক, দেশের শত্রু নয়।’ এ কি সাস্থনা না যন্ত্রণা? রাজনীতি এমনই নির্মম যে, মহত্তম সাধুকেও বৈদান্তিকতায় অটল রাখতে পারে না। রাখতে পারলে হয়তো বলতেন, সুভাষ বোসের জয় আমারই জয়।<sup>১</sup> গান্ধীজীর প্রতি সুভাষের কী প্রাণপাত শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ দিলেন সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষের কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপন ও কংগ্রেস বিদ্রোহকে সমর্থন করে লিখলেন, ‘আজ আমি জানি বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের।’ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। শারীরিক ও মানসিক গঠনে, আচার-আচরণে এবং জীবন ধারায়, আদর্শে ও কাজে, শৌর্ষে ও বীর্যে—এক কথায় তার সমগ্র ব্যক্তিত্বে ও কীর্তিতে তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের এক অনন্য চরিত্র।<sup>২</sup> বাল্যকাল থেকেই বিদ্রোহী সুভাষ তাঁর জীবনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমাগতই হয়ে উঠেছিলেন মানবদরদি, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আলোকে উদ্ভাসিত এক আধ্যাত্মিক যুবক এবং সবশেষে কঠিন পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে ‘জাতির ক্ষমতাতত্ত্বের মূর্ত বিকল্প।’ আলোচ্য প্রবন্ধে

এই মহান চরিত্রের একটিমাত্র বিশেষ দিকের প্রতি আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো তা হলো তাঁর দেশভাবনা সম্পর্কে।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে কিন্তু মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছে। ভারতের একটা বাণী আছে যেটা জগৎ সভায় শুনাতে হবে; ভারতের শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে যা বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং যা



গ্রহণ না করলে বিশ্বসভ্যতার প্রকৃত উন্মেষ হবে না। শুধু তাই নয়—বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায় বাণিজ্য এসব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু দেবে ও কিছু শেখাবে। তাই ভারতের মনীষীগণ কত তমোময় যুগের মধ্যেও নির্নিমেষ নয়নে ভারতের জ্ঞানপ্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তাঁদের সন্ততি আমরা, আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য সফল না করে কি মরতে পারি?° মানুষের উন্নতির পথে সবথেকে বড়ো অন্তরায় হলো ভ্রান্ত আদর্শ। মানুষের সমস্ত প্রাণ যদি উদ্বুদ্ধ করতে হয়, তার প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্যে যদি মৃতসঞ্জীবনী সুধা ঢালতে হয়, তার অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তির স্ফূরণ যদি ঘটাতে হয় তাহলে একটা মহত্তর আদর্শের আশ্বাদ তাকে দেওয়া চাই। মানুষ শুধু উদর পূরণের জন্য বাঁচে না। তার জীবনধারণের জন্য মনের খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষ জানতে চায় তার জীবনের উদ্দেশ্য কী? শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকা, শুধু আহার নিদ্রা মৈথুন? তাহলে মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর যদি মানুষ ঠিকমত না পায় তাহলে সে জীবনের শক্তি পায় না। নিজের জীবন ব্যর্থ বলে মনে করে। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের মধ্যেই তিনি এর উত্তর পেয়েছেন এবং সেই আদর্শের ভিত্তিতেই তাঁর স্বদেশচিন্তা গড়ে উঠেছে। তিনি ছাত্রসমাজকে তাই বলছেন, ‘হে বাঙ্গলার ছাত্র ও তরুণ সমাজ! তোমরা পরিপূর্ণ ও অখণ্ড মুক্তির উপাসক হও। তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী; অতএব তোমরাই সমস্ত জাতিকে জাগাবার ভার গ্রহণ কর। তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে অনন্ত, অপারিসীম শক্তি। এই শক্তির উদ্বোধন কর এবং নবশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত কর; তোমাদের নিকট নতুন স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত সমস্ত জাতি আবার বেঁচে উঠুক।° সুভাষচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছেন, যেদিন থেকে ভারত পরাধীন

হয়েছে সেইদিন থেকেই ভারত সমষ্টিগত সাধনা ভুলে ব্যক্তিগত স্বার্থে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে। ফলে এই দেশে শতশত মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্ত্বেও জাতি তাদের আদর্শকে জীবনে গ্রহণ করেনি বলেই এই শোচনীয় অবস্থা। জাতিকে আবার বাঁচাতে হলে সাধনার ধারা অন্যদিকে পরিচালিত করতে হবে। জাতিকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিত্বের সার্থকতা নেই—একথা সকলকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। আমাদের জাতির বহুলোক পুরুষানুক্রমে বহু জ্ঞান ও সম্পদ আহরণ করে আসছে কিন্তু সেই জ্ঞান ও সম্পদের অধিকারী হতে পারেনি সমগ্র জাতি। ফলে এখন থেকে সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, যে ভারতের প্রতিষ্ঠা আমরা করতে চাই—সেখানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার, সমান দাবি ও সমান সুযোগ থাকবে।

১৯২৯ সালের ২১ জুলাই ছগলী জেলা ছাত্র সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাবে তাঁর স্বদেশচিন্তা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ১৫ বৎসর পূর্বে যে আদর্শ বাঙ্গলার ছাত্র সমাজকে অনুপ্রাণিত করত তা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ। সে আদর্শের প্রভাবে তরুণ বাঙ্গালি ষড়রিপু জয় করার, স্বার্থপরতা ও সকল প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির বলে শুদ্ধ-বুদ্ধ জীবন লাভের জন্য বদ্ধপরিকর হতো। সমাজ ও জাতি গঠনের মূল ব্যক্তিত্ব বিকাশ। তাই স্বামী বিবেকানন্দ সর্বদা বলতেন, ‘খাঁটি মানুষ তৈরি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বিকাশের দিকে এত জোর দিলেও স্বামী বিবেকানন্দ জাতি গঠনের কথা ভুলে যাননি। কর্মবিহীন সন্ন্যাসে অথবা পুরুষকারহীন অদৃষ্টে তিনি বিশ্বাস করতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস নিজের জীবনের সাধনার ভিতর দিয়ে সর্বধর্মের যে সমন্বয় করতে পেরেছিলেন তাই স্বামীজীর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল এবং তাই ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয়তার মূল ভিত্তি। এই সবধর্ম সমন্বয় ও সকল মত সহিষ্ণুতার প্রতিষ্ঠা না হলে আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে জাতীয়সৌখ নির্মিত হতে পারত না। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতকের প্রারম্ভে স্বাধীনতার

অখণ্ডরূপের আভাস শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ স্বাধীনতার যে অখণ্ডরূপ তুলে ধরেন তা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ করে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ভাবনায়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা শুরু হলো তারপর থেকেই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর ভাবনায় তুলে ধরেন, মানুষের জীবন, জাতির এবং ব্যক্তির জীবন একটা অখণ্ড সত্য। এই জীবনকে বহুখা বিভক্ত করা যায় না। মানুষের প্রাণ যখন জাগে তখন সব দিক দিয়ে জাগরণের পরিচয় দেয় এবং সর্বক্ষেত্রে নবজীবনের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর এই সর্বদীর্ঘ বিকাশের সাধনাকে এই যুগের সাধনা বলে বিশ্বাস করতেন। তিনি বললেন, আজ সারা ভারতকে বলে দিতে হবে, যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখি—সে রাজ্যে সকলে মুক্ত, ব্যক্তি মুক্ত, সমাজও মুক্ত, সেখানে মানুষ রাষ্ট্রীয় বন্ধন থেকে মুক্ত, সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত এবং অর্থের বন্ধন থেকে মুক্ত। রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থনীতি—এই ত্রিতাপ থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করতে হবে।<sup>৭</sup> সুভাষচন্দ্রের ভাবনা এ ক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট। জাতির মুক্তি হলো অন্তর্দ্বন্দ্ব, সামাজিক বিভেদ, জাতপাত ও সম্প্রদায়ের বিভেদ, অস্পৃশ্যতা, প্রকৃত ধর্মকে না বুঝে ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জাতীয় মুক্তির প্রধান শর্ত। সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা একইসঙ্গে সংঘটিত না হলে প্রকৃত বন্ধনমুক্তি ঘটবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘আমাদের এই শত ছিদ্রযুক্ত, পুতিগন্ধময় সমাজের দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কোনো দিন হবে না। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সমস্ত জাতিকে মুক্তিলাভের জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হতে হবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সামাজিক অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট অথবা অর্থনৈতিক বৈষম্যে ভারাক্রান্ত, সে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য পাগল হবে কেন? যার কাছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অত্যাচারই সবচেয়ে বড় সত্য—সে ব্যক্তি এইসব অত্যাচার থেকে মুক্ত না হতে পারলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্গ্রীব হবে কেন? এক্ষেত্রে স্বামীজীর

স্বদেশমন্ত্রের মর্মবাণীকে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরংঘতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত তুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বভাগী শঙ্কর; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত তোমার ভাই।..... বল মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই...।’ সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বলেছেন, ‘আজ দেশের মধ্যে তিনটি বড়ো সম্প্রদায় একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে—নারী, উপেক্ষিত তথাকথিত অনুল্লত সমাজ এবং কৃষক ও শ্রমিক সমাজ। ইহাদের নিকট গিয়া বল—তোমরাও মানুষ, মনুষ্যত্বের পূর্ণ অধিকার তোমরাই পাইবে। অতএব ওঠো, জাগো, নিশ্চেষ্টতা পরিহার করিয়া নিজের অধিকার কাড়িয়া লও।’ সুতরাং স্বামীজীর স্বদেশ ভাবনার আদর্শকেই সুভাষচন্দ্র বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে নিজের মহাজীবন দিয়ে লক্ষ লক্ষ জীবনকে মায়ের জন্য বলি দিতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর অনন্যচিত্ত উৎসর্গ, সর্বস্ব ত্যাগ, সেবা, অদম্য সাহস এবং আদর্শের জন্য অন্তহীন আত্মসমর্পণ দিয়ে। এই সাধনায় তাঁর মত সাফল্য অর্জনকারী নেতা ভারতের ইতিহাসে বিরল। সেবার সঙ্গে, আত্মবোধের সঙ্গে, মানুষ তৈরির সাধনা কীভাবে যুক্ত সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ‘সেবার উদ্দেশ্য লোককে ‘মানুষ’ করে তোলা। যতদিন না নিজেরা মানুষ হচ্ছি, ততদিন কী করে লোককে মানুষ করব?... যে দেশে এককালে মানুষ জন্মেছিল সে দেশ

আবার বড়ো হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ‘জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনো।’ ...আজ আমরা আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি। আত্মবিশ্বাস আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে—নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস আনতে হবে। যাঁদের গৌরবে আমরা আজ গর্ব অনুভব করি, তাঁদের জীবনী আলোচনায় দেখতে পাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ বা জগদীশচন্দ্র প্রমুখ সকলেই জীবনের গোড়া থেকে এমনই আত্মবিশ্বাস পেয়েছিলেন।<sup>১</sup> বেরোয়া ত্যাগে ও যন্ত্রণা সহনের উল্লাসে কীভাবে ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়—‘জীবনে আমরা দিয়া যাইব—চাহিব না। যে নাম চায় না, যশ চায় না, স্বর্গ চায় না—তার দুঃখ কোথায়? আমরা যখন অন্যের নিকট হইতে কিছু চাই কিছু তা পাই না—তখনই আমাদের জীবনে দুঃখ আসে। স্বামীজী বলিতেন—‘ফিরে যেবা চায়, তার সিদ্ধি বিন্দু হয়ে যায়।’<sup>২</sup> সূত্রাং একটি স্বাধীন দেশের মূলভিত্তিটা এই রকম বেরোয়া ত্যাগের আদর্শেই স্থাপন করতে চেয়েছিলেন নেতাজী। গুরুত্ব দিয়ে বলতেন, ‘আমাদের দেশবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক মানসিকতার বড়ই অভাব। এই রাষ্ট্রীয় মনোভাব বা রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি সৃষ্টি করাই কংগ্রেসের অন্যতম উদ্দেশ্য। জাতির মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তি না আসিলে সে জাতি বহু বৎসর ধরিয়া সর্বস্ব বিলাইয়া আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার সামর্থ্য পাইবে না।’

২৯ ডিসেম্বর ১৯২৯ মেদিনীপুর যুব-সম্মিলনীতে সভাপতির ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল সমাজতান্ত্রিক ভারত গঠনে তাঁর ভাবনা সম্পর্কিত। তিনি বলছেন, ‘পূর্ণ সাম্যবাদের উপর নতুন সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। জাতিভেদের অচলায়তনকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে হইবে; নারীকে সর্বভাবে মুক্ত করিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে পুরুষের সহিত সমান অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করিতে হইবে; অর্থের বৈষম্য দূর করিতে হইবে এবং ধর্ম-বর্ণ- নির্বিশেষে প্রত্যেকে যাতে শিক্ষার ও উন্নতির সমান সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমাজতন্ত্রমূলক সম্পূর্ণ রাষ্ট্র যাহাতে

স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য সচেতন হইতে হবে।’ সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ, রাশিয়াতে বলশেভিজম যোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের যেমন মিল ছিল আবার পার্থক্যও ছিল অনেক বেশি। তিনি মনে করতেন কোনো দেশের আদর্শ বা প্রতিষ্ঠান অন্ধভাবে অনুকরণ করা ঠিক নয়। দেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা, জাতীয় আদর্শ, নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের প্রয়োজন ও আবহাওয়ার কথা মনে রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভাবনা ভাবতে হবে। নিজেকে সাম্যবাদী বলে অভিহিত করতেন নেতাজী। প্রাচীন ভারতের সাম্যের আদর্শের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ধারণার যে সহাবস্থান তাতেই ছিল তাঁর বিশ্বাস। ভাবগত দিক দিয়ে তিনি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করার পরিবর্তে ও ভারতের মাটিতে সমাজতন্ত্রের দেশীয় রূপায়ণের আদর্শের কথাই বলেছেন। কতিপয় বিশেষজ্ঞের গবেষণা অনুযায়ী, সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা কিছুটা ছিল জার্মানি অর্থনীতিবিদ জোহান গেসেলের অর্থনৈতিক তত্ত্বের অনুসারী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধা হিসাবে নেতাজী ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তবু তিনি অন্ধ দেশভক্ত ছিলেন না। যে জাতীয়তা সৃষ্টিশীলতা জাগিয়ে তোলে, জনসেবার ব্রতে দীক্ষিত করে তোলে মানুষকে, সেই জাতীয়তারই ভক্ত ছিলেন তিনি।

সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, স্পর্ধা ও ধ্বংসের মন্ত্রে দীক্ষিত জাতীয়তাকে তিনি ঘৃণা করতেন। নাৎসি জার্মানির জাতিবিদ্বেষকে তিনি ঘৃণা করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশকে তিনি স্বাধীনতা এনে দিতে পারবেন, তাই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে পরিকল্পনাতেও ছিল তাঁর আগ্রহ। ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষ হবে শিল্পনির্ভর একটি আধুনিক শক্তি, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতার অবসান ঘটিয়ে যেখানে আসবে সর্বাঙ্গীণ ব্যবহারিক ও আত্মিক উন্নতি।<sup>৩</sup>

স্বামীজীর ‘নাচুক তাহাতে শ্যামা’ কবিতাটি ছিল সুভাষচন্দ্রের খুবই প্রিয়। প্রায়ই তার থেকে আবৃত্তি করতেন সংযত উচ্ছ্বাসে, যেন তার মধ্যে পেয়েছিলেন নিজের

আদর্শের বাণীপ্রতিমাটি—

“জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?

দুঃখভার, এ ভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেতভূমি চিতামাঝে।।

পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।

চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা।।”

স্বামী বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাসের আর এক নাম ‘মৃত্যুকে ভালোবাসা’।

তাই বিবেকানন্দকে ভালবাসার অধিকার আছে একমাত্র তাঁরই যাঁর মৃত্যুকে ভালবাসার সাহস আছে, প্রতি পদক্ষেপে পরাজয়, অপমানকে যে কণ্ঠহার হিসেবে গলায় ধারণ করতে প্রস্তুত, কলম্বাসের মতো যে বলতে পারে—‘ডেথ ইজ দা ব্রেথ অব মাই লাইফ’। সুভাষচন্দ্র ছিলেন তেমনই একজন।<sup>৪</sup> ১৯৪০ সালে নেতাজী লেখেন, “এই নশ্বর দুনিয়ায় সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়, সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে থাকে কেবল ভাবনা, আদর্শ ও স্বপ্ন।” আজও স্বামীজী ও নেতাজীর আদর্শে দেশ ও জাতি গঠনের স্বপ্ন অপূর্ণ থেকে গেছে। যদিও সেই তাগ ও সেবার আদর্শ শেষ হয়নি, হবেও না। কোনো একদিন সেই স্বপ্নের ভারতসূর্য আমরা নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করবো। হতাশা নয়, নেতাজীর মতোই আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ক্রমবিবর্তনের চাকা ঘোরে এবং এইভাবেই ভাবনা, আদর্শ ও স্বপ্নপ্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে বাহিত হয়ে চলেছে।

### সূত্র নির্দেশ :

- ১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—উদ্যত খজা, কলকাতা ১৪২৬, পৃঃ ৩৭২ (২) শিশির কুমার বসু—অনির্বাণ জ্যোতি, কলকাতা ২০১৮, পৃঃ ১২৪ (৩) সুভাষ চন্দ্র বসু সমগ্র রচনাবলী (৩য় খণ্ড), কলকাতা ২০১৫, পৃঃ ১৬৭ (৪) পূর্বোক্ত—পৃঃ ১৮৫ (৫) ঐ — পৃঃ ১৮৪ (৬) শঙ্করীপ্রসাদ বসু—বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (৭ম খণ্ড) কলকাতা ২০০৯, পৃঃ ১৪৫ (৭) পূর্বোক্ত — পৃঃ ১৩৮। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত) চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ (স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের প্রবন্ধ) পৃঃ ৯১৬, কলকাতা ২০১০।

# মানবোন্নতির চেতনাগত যাত্রা

## কর্ম থেকে ব্রহ্মবোধ

অনামিক রায়

॥ পর্ব-১ ॥

মানুষের জীবন কেবল দৈহিক অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা নয়, এটি এক গভীর চেতনাগত যাত্রা। মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য হলো নিজের উন্নতি সাধন করা, কারণ মানুষের মধ্যেই সেই শক্তি নিহিত আছে যার দ্বারা সে নিজেকে যেমন গড়ে তুলতে পারে, তেমনি ভেঙেও ফেলতে পারে। মানুষ যে রূপে নিজের মন, বুদ্ধি ও চরিত্রকে গঠন করে, শেষ পর্যন্ত সে নিজেও সেই রূপেই গঠিত হয়। এখানে কোনো বাহ্যিক শক্তি নয়, মানুষের নিজের জ্ঞান ও কর্মই তার পরিচয় নির্ধারণ করে। এই আত্মগঠনশীল ক্ষমতার কারণেই মানুষ অন্য সব জীবের উর্ধ্বে অবস্থান করে।

মানুষের চেতনা একটি দ্বিমুখী প্রবাহের মধ্যে অবস্থান করে। একদিকে রয়েছে ক্ষমা, দয়া, সত্য, ন্যায় ও ধর্মসম্মত জীবনযাপনের মতো গুণাবলী, যা মানুষকে ক্রমশ দেবত্বের দিকে নিয়ে যায়। এই গুণগুলো হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের চিন্তা বিশুদ্ধ হয় এবং কর্ম কল্যাণমুখী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও হিংসার প্রভাব মানুষকে ধীরে ধীরে পশুত্বের দিকে ঠেলে দেয়। তখন মানুষ বিবেকের পরিবর্তে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয় এবং নিজের মানবিক মর্যাদা হারাতে শুরু করে। এই দুই প্রবাহের মধ্যে প্রতিনিয়ত দাঁড়িয়ে মানুষই সিদ্ধান্ত নেয় সে কোন পথে অগ্রসর হবে। ক্ষমা ও দয়ার প্রতিষ্ঠা যে দেব গতি, তার কারণ হলো এগুলি মানুষের অহংকার ক্ষয় করে এবং চেতনাকে প্রসারিত করে। আর কাম ও ক্রোধের আধিপত্যকে অসুর গতি বলা হয়, কারণ এগুলি চেতনাকে সংকুচিত করে এবং মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক ও হিংস্র করে তোলে। তবে শুধু নৈতিক গুণাবলী থাকলেই চূড়ান্ত উৎকর্ষ ঘটে না। যখন এই দেব গুণাবলীর সঙ্গে ভগবদ্ভক্তি, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান যুক্ত হয়,

তখন মানুষ দেবত্বের স্তর অতিক্রম করে দেবর্ষিত্বের দিকে অগ্রসর হয়। এই অবস্থায় মানুষ কর্ম করে, কিন্তু কর্মে আসক্ত থাকে না, জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু অহংকারে ভোগে না।

এই উত্তরণের পথে জ্ঞান ও কর্মযোগের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান মানুষকে দিশা দেয়, আর কর্ম সেই জ্ঞানকে জীবনে বাস্তবায়িত করে। এই দুইয়ের বিচ্ছেদ হলে পতন অনিবার্য, কিন্তু এদের সামান্য সংযোগও মানুষকে অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে পারে। তাই বলা হয়েছে, এই যোগের অল্প প্রভাবও মানবজীবনে মহৎ রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। মানুষের প্রকৃত উন্নতি ঘটে তখনই, যখন তার অন্তরে ক্ষমা ও দয়াভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কাম-ক্রোধের প্রভাব ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। মানবজীবনের সর্ববৃহৎ ভয় কোনো বাহ্যিক বিপদ নয়, বরং এই অন্তর্গত পতন। যখন মানুষ নিজের চেতনাকে অবনমিত করে, তখন সে নিজের কাছেই ভয়ংকর হয়ে ওঠে। তাই মানবজীবনের সার্থকতা নিহিত আছে এই

আগে মানুষ ভালো  
হতে চাইত, এখন  
ভালো হওয়াটা  
স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে।  
আগে বৈরাগ্য ছিল  
অনুশীলন, এখন তা  
স্বাভাবিক; আগে ভক্তি  
ছিল সাধনা, এখন তা  
নিঃস্বাসের মতো।

সচেতন নির্বাচনে—উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া, পশুত্ব অতিক্রম করে দেবত্ব ও দেবর্ষিত্বের দিকে যাত্রা করা এবং শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয়ে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

এই যাত্রার শেষ কথা হলো—মানুষের উন্নতি কোনো হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, এটি একটি ধারাবাহিক সাধনা। প্রতিদিনের চিন্তা, প্রতিদিনের সিদ্ধান্ত, এবং প্রতিদিনের কর্ম মিলিয়েই মানুষের ভবিষ্যৎ রচিত হয়। মানুষ যখন নিজের ভিতরের দুর্বলতাকে চিনতে শেখে এবং সেগুলোর উপর সচেতন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তখনই প্রকৃত মানবোন্নতি শুরু হয়। আত্মসমালোচনা এখানে আত্মঅবমাননা নয়, বরং আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ। নিজের কামনা, ক্রোধ ও লোভকে দেখা ও স্বীকার করাই তাদের অতিক্রম করার পথ খুলে দেয়।

এই প্রক্রিয়ায় ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এক অস্তিত্ব। সংসারের মধ্যে অবস্থান করেও মানুষ বৈরাগ্য চর্চা করতে পারে, কর্মের মধ্যে থেকেও আসক্তি ত্যাগ করতে পারে। এখানেই কর্মযোগের মহত্ত্ব—কর্ম করা থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, বরং কর্মকে শুদ্ধ করা। যখন মানুষ নিজের কর্তব্যকে ঈশ্বরার্ণণ বলে গ্রহণ করে, তখন কর্ম বন্ধন নয়, মুক্তির মাধ্যম হয়ে ওঠে। ক্রমে মানুষ উপলব্ধি করে যে সে কেবল দেহ বা মন নয়, বরং চেতন্যের এক বিস্তৃত রূপ। এই উপলব্ধিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সার। তখন ক্ষমা ও দয়া কেবল নৈতিক গুণ থাকে না, সেগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। অপরের দুঃখে মানুষের হৃদয় নড়ে ওঠে, কারণ সে অপরকে নিজের থেকে পৃথক মনে করে না। এই অবস্থায় মানুষ দেবর্ষির মতো—সংসারে থেকেও সংসারের উর্ধ্বে।

অবশেষে এই চেতনা যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন মুক্তির ধারণা আর ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি থাকে না, বরং বর্তমানেরই এক বাস্তবতা হয়ে ওঠে। মানুষ তখন আর ভয়, লোভ বা মৃত্যুর দ্বারা চালিত হয় না। সে জানে, পতনই আসল ভয়, আর উন্নতিই প্রকৃত নিরাপত্তা। এই উপলব্ধির মধ্যেই মানবজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা নিহিত—নিজেকে গড়ে তোলা, নিজেকে অতিক্রম করা, এবং নিজের জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে আলোর দিকে অগ্রসর হওয়া।

শেষ পর্যায়ে এসে মানবজীবনের অর্থ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়। এখানে উন্নতি আর

কোনো লক্ষ্যপূরণের বিষয় থাকে না, বরং তা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখন আর ‘ভালো হবে’ বা ‘উন্নত হবে’ বলে চেষ্টা করে না—তার চিন্তা, অনুভব ও কর্ম স্ফূর্তভাবেই শুদ্ধ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় কামনা দুর্বল হয়ে যায়, ক্রোধ জন্ম নিলেও স্থায়ী হতে পারে না, লোভ আকর্ষণ হারায়, কারণ মানুষের ভিতরে এক গভীর পূর্ণতার অনুভূতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অপূর্ণতার বোধ থেকেই যেসব আসক্তি জন্ম নেয়, সেই অপূর্ণতাই এখানে বিলুপ্ত হয়।

এই স্তরে মানুষ জীবনের ঘটনাকে আর শত্রু বা বাধা হিসেবে দেখে না। সুখ ও দুঃখ, লাভ ও ক্ষতি, সম্মান ও অপমান—সবই তার কাছে শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে। কারণ সে বুঝে যায়, বাহ্যিক পরিস্থিতি তার চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে না, যদি সে নিজে তাকে সেই ক্ষমতা না দেয়। এখানেই ভয়ের অবসান ঘটে। মৃত্যু, ভবিষ্যৎ বা অনিশ্চয়তা আর আতঙ্কের কারণ থাকে না, কারণ মানুষ তখন নিজেকে সময়ের বাইরে এক চেতনাসত্তা হিসেবে অনুভব করে। এ অবস্থায় কর্ম সম্পূর্ণ নতুন অর্থ পায়। মানুষ কাজ করে, কিন্তু কাজের ফল তাকে বেঁধে রাখে না। সে দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু অহংকার জন্মায় না, সেবা করে, কিন্তু প্রত্যাশা পোষণ করে না। তার কর্ম অন্যদের উপকার করে ঠিকই, কিন্তু সে নিজেকে কর্তা মনে করে না। এই নিরহংকার কর্মই মানবজীবনের সর্বোচ্চ সৌন্দর্য, যেখানে ব্যক্তি নিজের সীমা অতিক্রম করে সমগ্রের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—এই অবস্থায় মানুষ আর নিজের পতনের সম্ভাবনাকেই ভয় পায় না, কারণ তার চেতনা এতটাই জাগ্রত যে সে পতনের পথেই আর হাঁটে না। পতন তখন কোনো বাহ্যিক বিপর্যয় নয়, বরং চেতনাগত অবক্ষয়—আর সেই অবক্ষয় সে অতিক্রম করে এসেছে। তাই মুক্তি কোনো মৃত্যুর পর প্রাপ্ত অবস্থা নয়, বরং চেতনাগত অবক্ষয়—আর সেই অবক্ষয় সে অতিক্রম করে এসেছে।

তাই মুক্তি কোনো মৃত্যুর পর প্রাপ্ত অবস্থা নয়, বরং জীবিত অবস্থায় অর্জিত এক অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টির মধ্যেই মানবজীবনের পরিপূর্ণতা নিহিত—যেখানে মানুষ নিজেকে গড়ে তোলে, নিজেকে ছাড়িয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত নিজেই অতিক্রম করে। এটি ব্রহ্মের ধারণার দিকেই ইঙ্গিত করে, তবে সরাসরি তাত্ত্বিক সংজ্ঞা হিসেবে নয়; বরং অনুভবযোগ্য ব্রহ্মবোধের

পথে যাত্রা হিসেবে। এখানে যে অবস্থাটির কথা বলা হয়েছে—যেখানে মানুষ আর কাম-ক্রোধে চালিত নয়, কর্ম করে কিন্তু কর্তার অহং নেই, সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করে না, এবং মুক্তি ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি না হয়ে বর্তমানের বাস্তবতা হয়ে ওঠে—এই অবস্থাটিই উপনিষদ ও বেদান্তে ব্রহ্মবোধ বা ব্রাহ্মানুভবের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে বর্ণিত। ব্রহ্ম কোনো বস্তু, ব্যক্তি বা আলাদা সত্তা নয়। ব্রহ্ম হলো সর্বব্যাপী চেতন্য, যা দেহ-মন-বুদ্ধির উর্ধ্বে। উপনিষদ বলে—‘সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম’।

অর্থাৎ ব্রহ্ম হলো অস্তিত্ব, চেতনা ও আনন্দের অবিভাজ্য রূপ। যখন মানুষ নিজেকে কেবল দেহ বা ব্যক্তিসত্তা বলে মনে করে, তখন সে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন এই সীমাবদ্ধতার বোধ ভেঙে যায়, তখন সে উপলব্ধি করে—‘আমি সেই চৈতন্যই’। বর্ণনায় যে ‘ভয়হীনতা’, ‘আসক্তিহীন কর্ম’ ও ‘পূর্ণতার অনুভূতি’র কথা এসেছে, সেগুলো ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, ব্রহ্ম নিজে নয়। আদি শঙ্করাচার্য খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন—ব্রহ্মকে জানা যায় না, ব্রহ্মকে হওয়া যায়। এই হওয়াটাই তখন প্রকাশ পায় চরিত্রে, কর্মে ও দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখানে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। দেবত্ব বা দেবর্ষিত্ব হলো এখনও গুণগত উৎকর্ষ—সত্ত্বগুণের চরম বিকাশ। কিন্তু ব্রহ্মবোধ হলো গুণের অতীত। সেখানে দৈব-অসুর, পুণ্য-পাপ, উন্নতি-পতন—এই দ্বৈততা অতিক্রান্ত হয়। মানুষ তখন ভালো হওয়ার চেষ্টায় থাকে না; ভালোত্ব তার স্বভাব হয়ে যায়। এখানে যে অবস্থাটির কথা বলা হলো, তা সগুণ থেকে নির্গুণের দিকে যাত্রার শেষ প্রান্ত। কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান এই যাত্রার বাহন। দেবর্ষিত্ব সেই সেতু, আর ব্রহ্মবোধ সেই তীর যেখানে পৌঁছে আর যাওয়ার কিছু থাকে না।

সবচেয়ে গভীর কথা হলো—বেদান্ত বলে না যে মানুষ ব্রহ্মকে ‘পাবে’, বলে, মানুষ নিজের অজ্ঞান ত্যাগ করলে আবিষ্কার করবে যে সে কখনো ব্রহ্ম থেকে পৃথকই ছিল না। এই দৃষ্টিতে দেখলে, পুরো বক্তব্যটি ব্রহ্মের সংজ্ঞা নয় বরং ব্রহ্মপ্রত্যাবর্তনের মানবীয় মানচিত্র। এটি একটি যাত্রা। ভালো গুণগুলো অভ্যাস করতে করতে তার সঙ্গে বৈরাগ্য, ভক্তি যুক্ত করতে করতে এগিয়ে গেলে এই ভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। এই যাত্রা শুরু হয় খুব সাধারণ জায়গা থেকে—অভ্যাস থেকে। মানুষ প্রথমে ‘ব্রহ্ম’ বোঝে না, বোঝার দরকারও নেই। সে প্রথমে শুধু এটুকু করে যে ক্ষমা চর্চা অনুশীলন, দয়া

শেখে, সত্য বলার চেষ্টা করে, সংযম আনে। শুরুতে এগুলো কষ্টকর হয়, কারণ তখন কাম-ক্রোধ-লোভ সক্রিয় থাকে। কিন্তু অভ্যাসের শক্তি খুব গভীর—বারবার অনুশীলনের ফলে মন ধীরে ধীরে অন্যরকম গঠন পেতে থাকে। গুণ তখন আর চাপিয়ে দেওয়া কিছু থাকে না, স্বভাব হয়ে ওঠে।

এই পর্যায়ে বৈরাগ্য আসে, কোনো ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে নয়, বরং এক ধরনের ক্রান্তি থেকে। মানুষ দেখে—ভোগ দিয়েও স্থায়ী তৃপ্তি আসে না। তখন ভোগের প্রতি আকর্ষণ নিজে থেকেই টিলে হয়। এটাই আসল বৈরাগ্য—পালিয়ে যাওয়া নয়, বুঝে যাওয়া। আর এই বুঝে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে জায়গা তৈরি হয় ভক্তির জন্য। ভক্তি এখানে কেবল পূজা বা নামজপ নয়, ভক্তি মানে হলো—নিজের সীমাবদ্ধ ‘আমি’-কে একটু একটু করে বৃহত্তরের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

এই অভ্যাস, বৈরাগ্য ও ভক্তি একসঙ্গে চলতে চলতেই ভাবের পরিবর্তন শুরু হয়। মানুষ লক্ষ্য করে—যে বিষয়গুলো আগে রাগ জাগাত, সেগুলো আর ততটা স্পর্শ করছে না। যে অপমান আগে আঘাত করত, এখন সেটা পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে গেছে। কর্ম চলছে, কিন্তু ভিতরে একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এই দূরত্বই আসলে জ্ঞানচর্চার প্রথম ফল। তখন জ্ঞান আর বইয়ের বিষয় থাকে না; জীবন নিজেই উপনিষদ হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে—চেষ্টা করার ভাবটা মিলিয়ে যায়। আগে মানুষ ভালো হতে চাইত, এখন ভালো হওয়াটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে ওঠে। আগে বৈরাগ্য ছিল অনুশীলন, এখন তা স্বাভাবিক; আগে ভক্তি ছিল সাধনা, এখন তা নিঃশ্বাসের মতো। এখানেই বলা যায়—ভাব ‘প্রকাশ পাচ্ছে’। এটা মনে হওয়া নতুন কিছু নয়, বরং আচ্ছাদন সরে যাওয়া। এই যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে মানুষ হঠাৎ করে নতুন কিছু লাভ করে না। বরং সে বুঝতে পারে—যেটাকে সে এতদিন খুঁজছিল, সেটাই সে সবসময় ছিল। ব্রহ্মবোধ তখন কোনো অলৌকিক অভিজ্ঞতা নয়, বরং এক গভীর স্বস্তি—আর কিছু হওয়ার নেই, আর কোথাও যাওয়ার নেই। কিন্তু এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে যে পথ, সেই পথটাই মানবজীবনের সৌন্দর্য—গুণের চর্চা, বৈরাগ্যের পরিপক্বতা, ভক্তির গভীরতা এবং ধীরে ধীরে অহংকারের বিলয়। □



## ঋতুসন্ধিকালে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় নিমপাতা, আমলকি ও সজনে উঁটা

অধ্যাপক (ডাঃ) দেবশিস পাহাড়ী

ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে আর এর সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে আবহাওয়া। ঠাণ্ডা থেকে ধীরে ধীরে গরমের দিকে এগোচ্ছে তাপমাত্রা। বায়ুমণ্ডলীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আয়ুর্বেদ অনুসারে এই সময়কে বলা হয় ‘সন্ধিকাল’। এই সন্ধিকালে, বসন্ত ঋতুতে গরম থেকে শীত, নয়তো শীত থেকে গরমের দিকে আমরা সবাই এগিয়ে যাই। এই সন্ধিকালে পরিবেশে সক্রিয় হয়ে ওঠে নানারকম ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া। এর ফলে এই সময় মানব শরীরে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রকার সংক্রমণ ঘটতে থাকে। বাড়তে থাকে নানা রোগের প্রকোপ। আয়ুর্বেদে এই বিষয়টিকে ‘জীবাণু সংক্রমণ’ আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডায় জীবাণুগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বা ভালো কাজ করতে পারে না। মানে তারা আমাদের শরীরে সেই অর্থে আঘাত হানতে পারে না। কিন্তু এই সন্ধিকালে, যখন না ঠাণ্ডা, না গরম, ঠিক সেই সময়ে এরা আমাদের শরীরে আঘাত হানে এবং আমরা সংক্রামিত হই। এই সময় নানাপ্রকারের রোগ আমাদের কাবু করে দেয়। এই সময় এই জীবাণুগুলির গতিপ্রকৃতির একটু পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। এই ঋতুসন্ধিকাল বিষয়ে আয়ুর্বেদে রীতিমতো চর্চা হয়ে থাকে। কেননা যে জীবাণুগুলির সংক্রমণের ফলে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে, সেটা প্রতিরোধ করতে আমরা প্রকৃতির শরণাপন্ন হয়ে থাকি। প্রকৃতির কাছ থেকে পাওয়া নানা বিষয়ের প্রয়োগে শরীরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র।

এই সময় পাওয়া যায় সজনে উঁটা। এর ইংরেজি নাম হলো— মোরিঙ্গা। এর নানা ধরনের গুণ রয়েছে। সজনে ফুল ও উঁটা বিশেষভাবে রোগ প্রতিরোধী। বিভিন্ন ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াকে মানব শরীরের ধারেপাশে ঘেঁষতে না দেওয়ার জন্য একটি প্রতিরোধ বলয় তৈরি করে থাকে সজনে। ফলে দেখা যায় যে, এই ঋতুসন্ধিকালে আমাদের শরীরকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতিই যেন একটি রক্ষাকবচ দিয়ে দিয়েছে।

এই সময় নিম গাছে নির্গত হয় কচি পাতা। আমরা যদি আমাদের খাদ্যতালিকায় নিয়মতিভাবে কচি নিমপাতা রাখার চেষ্টা করি, তাহলে খুব ভালো হয়। এই নিমপাতাকে আমরা নানাভাবে খেতে পারি। তরকারিতে দিয়ে খেতে পারি, আবার ভেজেও খেতে পারি। অনেকে আবার ছোটো ছোটো বাড়ি বানিয়ে রেখে দেন, সেটা নিয়মিত খান। নিমপাতার গুণাগুণ বলতে গেলে একটা কথাই বলতে হয় যে, এই সময় মানব শরীরে যে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে নিমপাতা। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাবর্ধক হলো কচি নিমপাতা। এছাড়াও নিমপাতা

আমাদের শরীরের রক্তকে শোধন করে।

ঋতু পরিবর্তনকালীন সময় ছোটোদের মধ্যে অ্যালার্জির একটা প্রবণতা দেখা যায়। অ্যালার্জির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমলকির ব্যবহার করা যেতে পারে। আমলকির ব্যবহার করলে ছোটোদের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায়।

এই সময় আমাদের শরীর শুকিয়ে যায়। তাই এই সময় প্রতিদিন আমাদের কমপক্ষে তিন লিটার জল পান করতে হবে। শরীরে জলের প্রয়োজনীয়তা মিটলে জলের অভাব পূরণ হবে। সেক্ষেত্রে ছোটোদের তো বটেই, বড়োদেরও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মনে রাখতে হবে, জল বেশি মাত্রায় পান করলে আমাদের মল ও মূত্র স্বাভাবিক থাকে। যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় মল-মূত্র সৃষ্টি হয়, সেই প্রক্রিয়া দুটি ঠিক ঠাক থাকলে, জীবাণু সংক্রমণের মাত্রা অনেকটাই কমে যাবে।

এই সময় বাচ্চাদের ও বয়স্কদের সর্দি-কাশি হতে দেখা যায়। শুধু বাচ্চা কেন, বড়োরাও সর্দি-কাশি-সহ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এই সময় তুলসীপাতার রসের সঙ্গে আদার রস ও মধু মিশিয়ে খেলে খুব উপকার হয়। এই সময় আমরা বড়োদের চ্যবনপ্রাশ খেতে বলি। নিয়মিত চ্যবনপ্রাশ সেবনেও সর্দি-কাশি হতে উপশম লাভ হয়।

(লেখক বিশিষ্ট আয়ুর্বেদ  
চিকিৎসক)

# বসন্তকালে ছোটদের চোখের সংক্রমণ রুখতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুব জরুরি

ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত

শীত পেরিয়ে বসন্ত এসেছে। আর এই সময়ে আমাদের শরীরে অনেকটাই অলক্ষ্যে নানা কিছুর সংক্রমণ ঘটে। কারণ এই সময়ে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার পরিমাণ পরিমাণ খুব বেশি থাকে, আর সঙ্গে থাকে বিভিন্ন ফুলের রেণু, বিভিন্ন রৌঁয়া জাতীয় বস্তু, এমন কিছু ফলের রৌঁয়া ছোটদের চোখে নানা ভাবে সংক্রমণ ছড়ায়। এটাকে আমরা বলে থাকি ‘ওয়ার্ম ওয়েদার কঞ্জাঙ্কাটিভাইটিস’ বলে থাকি। এটি সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল, এমনকী মে মাস পর্যন্ত থাকে। আর এই বসন্তকালেই এই সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। এটা ঋতু পরিবর্তনের কারণে যখন ঠাণ্ডা থেকে গরমে যাচ্ছে বা গরমকালে সামান্যতম আবহাওয়ায় তাপমাত্রার সামান্যতম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, সেই সময় এই চোখের সংক্রমণ ছোটদের মধ্যে দেখা যায়। কারণ সেই একটাই ওই ভাসমান পরাগ রেণু। এই সংক্রমণ যে সব বাচ্চার হবে, তা নয়, যে সব বাচ্চার অ্যালার্জি হবার প্রবণতা রয়েছে, শুধুমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই এই চোখের সংক্রমণ বেশি হতে দেখা যায়। একটা উদাহরণ দিলে একটু বোঝা যাবে। কোথাও একদল বাচ্চা বেড়াতে গেল। সেখানে দেখা গেল যে একটি বাচ্চার সর্দি, জ্বর হলো। হাঁচি-কাশি হয়ে গেল। সবার কিন্তু হলো না। এখানে কারণ ওই অ্যালার্জি হবার প্রবণতা থেকেই আক্রান্ত হওয়া। সেই রকম চোখের এই



কঞ্জাঙ্কাটিভাইটিস সব বাচ্চার হবে না। শুধুমাত্র যে বাচ্চার অ্যালার্জি হবার প্রবণতা রয়েছে শুধুমাত্র তারই হবে। এখানে একটি বিষয় অবাক করার মতো। এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বালকদের বেশি, বালিকাদের কম। মনে রাখতে হবে, এই সংক্রমণের ঘটনা কিন্তু দুটি চোখেই ঘটে। আরও একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি যে, এটি কিন্তু হোঁয়াচে সংক্রমণ নয়।

এই ধরনের সংক্রমণ হলে চোখ ভীষণ লাল হবে আর খুব চুলকাবে। এতটাই চুলকাবে যে চোখ মনে হবে চোখ বেরিয়ে আসছে। এই চুলকানির ফলে হিস্টামিন বলে একটি রস চোখের ভিতর বেরোয়, যা কিনা চুলকানিটাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। এই অবস্থায় বাচ্চাদের তো আর আটকানো যায় না। তাই একটু হলেও সাবধান হতে হবে। খুব চুলকাতে দেখলে খুব ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার জল দিয়ে চোখ ধুয়ে দিলে চুলকানি কমে যাবে। মাথায় রাখতে হবে, এই চুলকানি যদি চলতে থাকে, তাহলে কোনো ওষুধ কাজ করবে না।

অ্যালার্জি বেড়ে যাবে।

এই সংক্রমণ দু’ ধরনের হয়। একটি হলো চোখের সাদা অংশে হয়, যেটি বাইরে থেকে বোঝা যায়। আমাদের যে কর্নিয়া রয়েছে, তাঁর চার পাশে হয়। আরেকটি হচ্ছে চোখের পাতায়। চোখের পাতা ওলটালেই বোঝা যাবে। সেখানে উঁচু উঁচু কিছু একটা হয়েছে। লালচে রঙের হয়। এটি আমাদের দেশে খুব একটা দেখা যায় না। তবে প্রথমটি দেখা যায়। আর এটি বেশি হয় ছেলেদের মধ্যে। যাঁদের বয়েস ছয় থেকে কুড়ি বছর। এই সংক্রমণের প্রবণতা ছেলেদের বেশি। প্রতি একশো জনে নব্বই জন ছেলের হবে, আর দশ জন মেয়ের হবে।

এই সংক্রমণের চিকিৎসা কী? আমরা প্রথমে স্টেরয়েড দিয়ে সংক্রমণটাকে সামান্য কমানোর চেষ্টা করে থাকি। কারণ বেশি স্টেরয়েড ব্যবহার করলে চোখের নানারকম ক্ষতি হতে পারে। স্টেরয়েড দিয়ে সংক্রমণ কমিয়ে আমরা ব্যবহার করে থাকি স্টেরয়েড নয় অথচ কাজ একই রকম করবে, সে রকম ওষুধ। এটাকে বলা হয়, এনএসএআইডি। এই ড্রপটি দিলে প্রাথমিকভাবে কমে যাবে। তবে এভাবে নিজের চিকিৎসা নিজে না করে একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো। কেননা চোখ হচ্ছে আমাদের কাছে খুব স্পর্শকাতর একটি অঙ্গ। ফলে একমাত্র চক্ষু বিশেষজ্ঞের মতামত নিয়েই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত।

(লেখক একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ)

চরক সংহিতায় ঋতুচর্যা হলো ঋতু বা মরসুম অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি, জীবনধারা ও খাদ্যাভ্যাসের প্রাচীন আয়ুর্বেদিক নির্দেশিকা, যা শরীরের ত্রয়োদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) ভারসাম্যপূর্ণ রেখে রোগ প্রতিরোধ করে। চরক সংহিতার সূত্রস্থানের ‘তস্যশীতীয়’ অধ্যায়ে (ষষ্ঠ অধ্যায়) ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য এই বিশেষ খাদ্য ও জীবনযাপনের নিয়মাবলী বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চরক সংহিতায় বর্ণিত ঋতুচর্যা হলো ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার নিয়মাবলী। সুশ্রুত সংহিতার মতো, চরক সংহিতাতেও প্রধানত ৬টি ঋতু (শিশির, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত) অনুযায়ী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। এই নিয়ম পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো ঋতুভিত্তিক দোষ ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে আয়ুর্বেদিক নিয়ম ও পথ্য অনুসরণ করা। বিশেষ করে কফ দোষ প্রশমন, হজমশক্তি বৃদ্ধি, শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে শরীরের মানিয়ে নেওয়ার জন্য একটি জীবনধারা।

বসন্তঋতুতে কফ বৃদ্ধি পায় তাই হালকা, ব্যায়াম এবং কটু/তিক্ত স্বাদের খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

**চরক সংহিতা অনুযায়ী বসন্ত চর্যার প্রধান নিয়মাবলী :**

**ওষুধ :** বমন (বমি করানো) বা নস্য (নাকে তেল/ওষুধ দেওয়া) চিকিৎসা-সহ পঞ্চকর্ম গ্রহণ করা।

**আহার :** যব, গম, মধু, হালকা ও সহজেই হজম হয় এমন খাবার গ্রহণ করা উচিত।

**বর্জনীয় :** ভারী চর্বিযুক্ত, ঠাণ্ডা, মিষ্টি, টক ও তৈলাক্ত খাবার বর্জন করা



## ঋতুপরিবর্তনকালীন পর্যায়ে সুস্থ থাকার উপায় বসন্ত চর্যা

### ডাঃ নূপুর বিশ্বাস

উচিত।

**জীবনযাত্রা :** নিয়মিত শরীরচর্চা (ব্যায়াম), ব্যায়ামের পর উদ্ভর্তন (মালিশ) স্নান এবং রোদ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে।

**পানীয় :** আদা মিশ্রিত ফোঁটানো উষ্ণ জল গ্রহণ করা যেতে পারে এটা কফ নাশক হিসেবে কাজ করে। বসন্তে শরীরকে কফ-জনিত রোগ থেকে রক্ষা করতে এই চর্যা বা নিয়মগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

**অষ্টাঙ্গ হৃদয় অনুযায়ী বসন্ত চর্চার প্রধান নিয়মাবলী :**

**ব্যায়াম ও শরীরচর্চা :** শরীর থেকে ঘাম বারানোর জন্য নিয়মিত ব্যায়াম, জগিং, হাঁটা বা দৌড়ানো উচিত।

**আহার :** হালকা (লঘু) এবং সহজে হজম হয় এমন খাবার (যেমন— যব বা

যবের ছাতু, গমের রুটি) খাওয়া। তিক্ত, কষায় এবং কটু (ঝাল/তীব্র) স্বাদের খাবার গ্রহণ করা। পুরনো চাল, মুগ ডাল এবং মধু ব্যবহার করা।

**বর্জনীয় :** গুরুপাক, তৈলাক্ত, মিষ্টি ও ঠাণ্ডা খাবার বর্জন করা।

**পানীয় :** জল হালকা গরম করে পান করা সবচেয়ে ভালো। মধু পান করা খুব উপকারী।

**পঞ্চকর্ম :** চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পঞ্চকর্ম (বমন বা নস্য) করা শরীরের জন্য উপকারী, যা জমে থাকা কফ দূর করে।

**জীবনযাত্রা :** দিনে ঘুমানো এড়িয়ে চলা এবং নিয়মিত শরীর চর্চা করা। সংক্ষেপে, বসন্তকালে অষ্টাঙ্গ হৃদয় অনুসারে শরীরকে হালকা এবং কফ-মুক্ত রাখার জন্য বিশেষ খাদ্য ও জীবনযাত্রা অনুসরণ করা হয়।

**সুশ্রুত সংহিতা অনুযায়ী বসন্ত চর্যার প্রধান নিয়মাবলী :**

**ব্যায়াম :** শ্লেষ্মা বা কফ কমানোর জন্য নিয়মিত ভারী ব্যায়াম (কুস্তি বা ধাবমান) অপরিহার্য।

**পঞ্চকর্ম (বমন ও নস্য) :** কফ কমানোর জন্য বমন (বমি) ও তীক্ষ্ণ নস্য (নাস্য) চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হয়।

**আহার :** হালকা, সহজে হজমযোগ্য ও কফবর্ধক নয় এমন খাবার খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

**দিনচর্যা :** সকালবেলায় ব্যায়াম করা, দিনে ঘুমানো (দিবানিদ্রা) সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত।

**পরিচ্ছন্নতা :** মুখগহ্বর পরিষ্কার রাখতে নিয়মিত কবল, গণ্ডুষ (কুলকুচি) করা দরকার।

বসন্তকালে শরীরকে সুস্থ ও কফ-মুক্ত রাখতে এই নিয়মগুলো মেনে চলা খুবই প্রয়োজনীয়

(লেখক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক)

# অভিষেক ধীরাজ ডোকানিয়া মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে কোন প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছিলেন?

## নিলয় সামন্ত

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মতো শতাব্দীপ্রাচীন এক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের নাম জড়িয়ে এমন এক অভিযোগ সামনে এল, যা শুধু বাংলা ফুটবলকেই অস্বস্তিতে ফেলেছে। রাজস্থানের তরণ ফুটবলার অভিষেক ধীরাজ ডোকানিয়াকে ঘিরে ওঠা এই ঘটনায় প্রশ্নের মুখে পড়েছে এক বিতর্কিত লগ্নিকারী সংস্থার ভূমিকা, যাদের হাতেই একসময় ছিল মহামেডানের ফুটবল দলের দায়িত্ব।

প্রশ্ন উঠছে, গত মরসুমে আদৌ কি অভিষেক ধীরাজ ডোকানিয়া মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে কোনো প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছিলেন? এমনকী প্র্যাকটিসেও কি তাকে নামতে দেওয়া হয়েছিল? মহামেডানের বহু সমর্থকই এই নামের সঙ্গে পরিচিত নন। অথচ ২০২৪-২৫ মরসুমে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে অভিষেকের নাম নথিভুক্ত হয়েছিল কালো সাদা ব্রিগেডের ফুটবলার হিসেবে। সেই সময়ে মহামেডানের ফুটবল বিভাগের সরাসরি দায়িত্ব ক্লাব কর্তৃপক্ষের হাতে ছিল না। দায়িত্ব ছিল সেই বহুচর্চিত লগ্নিকারী সংস্থা। অভিযোগ, সেই সংস্থার পক্ষ থেকেই অভিষেককে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং সেই আশ্বাসে ফুটবলারের বাবা ধীরাজ ডোকানিয়ার কাছ থেকে নেওয়া হয় মোট সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

ধীরাজ ডোকানিয়ার পাঠানো ইমেইল এবং ব্যাংক ট্রান্সফারের নথি অনুযায়ী, তিন দফায় এই টাকা দেওয়া হয়। প্রথম দফায় চার লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় দফায় এক লক্ষ টাকা এবং তৃতীয় ও শেষ দফায় আড়াই লক্ষ টাকা। ছেলেকে দেশের সেরা লিগে খেলানোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে ধীরাজবাবু শেষপর্যন্ত বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন, যখন

অভিষেক কলকাতায় এসে প্র্যাকটিস করার অনুমতিও পাননি।

কলকাতায় এসে অভিষেক কার্যত অনিশ্চয়তার গহবরে পড়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই সংশ্লিষ্ট সংস্থার আর কোনো আগ্রহ ছিল না। এর মধ্যেই মহামেডান ক্লাব ধীরে ধীরে আবার ফুটবল টিমের দেখভালের দায়িত্ব নিজের হাতে নিতে শুরু করে। তবে শেয়ার ট্রান্সফারের বিষয়টি নিয়ে ক্লাব কর্মকর্তাদের অযথা দেরি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। আইএসএলের ম্যাচ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর সেই সংস্থা কার্যত সরে যায়, মহামেডানকে চরম সংকটে ফেলে রেখে।

এই মুহূর্তে যারা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব পরিচালনা করছেন, তাঁদের কেউই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ক্লাবের নাম ব্যবহার করে আর্থিক শোষণ চলছিল, সেটা কেন আগে নজরে আসেনি। প্রিয় ক্লাবকে সামনে রেখে লগ্নির নামে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলার এই প্রবণতা রোখার ব্যর্থতা থেকেই যায়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ ধীরাজ ডোকানিয়া মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অফিসিয়াল ই-মেইলে চিঠি দিয়ে দাবি করেছেন, অবিলম্বে ওই সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ফেরত দিতে হবে। একই সঙ্গে তিনি ছেলের জন্য এনওসি চেয়েছেন এবং টাকা ফেরত না পেলে আইনি পদক্ষেপের হুমকি দিয়েছেন। ওই চিঠির অনুলিপি তিনি ক্লাব সভাপতি আমিরউদ্দিন ববির ইমেইলেও পাঠিয়েছেন। ফোন করে নিশ্চিত করা হয়েছে, ই-মেইল ঠিকানাটি সভাপতিরই। পুরো ঘটনা জেনে সভাপতি বিস্মিত বলে জানা গেছে। অন্যদিকে ক্লাবের আরেক শীর্ষ কর্মকর্তা কামারদা এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এই ঘটনার আরেকটি গুরুতর দিক হলো, অভিযোগ অনুযায়ী ঘুষ হিসেবে টাকা নেওয়ার পরই অভিষেকের নাম সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন

সিস্টেমে নথিভুক্ত করা হয়। দেশের আইনে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ। ফলে প্রতারণিত হলেও ধীরাজ ডোকানিয়াকেও আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হতে পারে। তাঁর ছেলের ফুটবল কেরিয়ার শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

ধীরাজবাবুর সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট, তিনি প্রবল মানসিক চাপে রয়েছেন। বিভিন্ন দিক থেকে তাঁর ওপর পালটা চাপ তৈরির চেষ্টাও চলছে। এমনকী তাঁকে নিরুৎসাহিত করে বলা হয়েছে, এই সব নিয়ে লেখালেখি করে কী লাভ। কিন্তু এই ঘটনা প্রকাশ্যে না আনলে সাংবাদিকতার সঙ্গে বেইমানি করা হতো বলেই মত অনেকের। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ধীরাজ ডোকানিয়ার কাছে মহামেডান ক্লাব সভাপতির ই-মেইল ঠিকানা এল কীভাবে। কে বা করা এই তথ্য দিলেন? ওই লগ্নিকারী সংস্থার কোনও শীর্ষ কর্তা, না কি কলকাতা ফুটবলের কোনও তথাকথিত শুভানুধ্যায়ী? উত্তর এখনও অধরা।

মহামেডান সমর্থকরা ভাবতেই পারবেন না, তাঁদের প্রিয় ক্লাবের নাম কীভাবে কলুষিত করা হয়েছে। যারা সত্যিকারের ফুটবল অনুরাগী, তারা যদি এই সংস্থাকে ময়দান থেকে বিতাড়িত করার দাবি তোলেন, তবে তা কি অন্যায্য হবে? সংসারের অভাব জেনে বুঝে যাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন, তাদের সঙ্গে কি আদৌ ঘর করা উচিত?

এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর প্রতিবাদকারীদের যদি বাংলার ফুটবলের ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়, তবে বুঝতে হবে কারা নিজেদের কায়োমি স্বার্থ রক্ষা করতে চাইছে। শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা ফোনে ধরা দেননি। তবে ঘটনা যে বাংলা ফুটবলের অন্দরমহলে গভীর ক্ষত তৈরি করেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। □

## মাহুত নারায়ণ

একটা গল্প শোন। কোনো এক বনে এক সাধু থাকতেন। তাঁর অনেকগুলি শিষ্য। তিনি একদিন

এদিকে মাহুত চাঁচিয়ে বলছে, ‘পালাও, পালাও’; শিষ্যটি তবু নড়ল না। শেষে হাতিটা শুঁড়ে



শিষ্যদের উপদেশ দিলেন যে, সর্বভূতে নারায়ণ আছেন, এইটি জেনে সকলকে নমস্কার করবে। একদিন একটি শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিয়েছিল। এমন সময়ে একটা রব উঠল, ‘কে কোথায় আছ পালাও— একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে।’ সবাই পালিয়ে গেল, কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে জানে, হাতিও যে নারায়ণ, তবে কেন পালাব? — এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল।

করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত হয়ে ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্যান্য শিষ্যরা তাকে ধরাধরি করে আশ্রমে নিয়ে গেল। আর ঔষধ দিতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে চেতনা হলে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, ‘তুমি হাতি আসছে শুনে কেন চলে গেলে না?’ সে বললে, ‘গুরুদেব আমায় বলে দিয়েছিলেন

যে, নারায়ণই মানুষ, জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি নারায়ণ আসছে দেখে ওখান থেকে সরে যাই নাই।’ গুরু তখন বললেন, ‘বাবা, হাতি নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য; কিন্তু বাবা, মাহুত নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।’ (সকলের হাস্য)

‘শাস্ত্রে আছে ‘অপো নারায়ণঃ’, জল নারায়ণ। কিন্তু কোনো জল ঠাকুরসেবায় চলে; আর কোনো জলে আঁচানো, বাসনমাজা, কাপড়কাচা কেবল চলে; কিন্তু খাওয়া বা ঠাকুরসেবা চলে না। তেমনি সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত-- সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ আছেন। কিন্তু অসাধু, অভক্ত, দুষ্ট লোকের সঙ্গে সদব্যবহার চলে না। মাখামাখিও চলে না। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ওইরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়।

॥ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত ॥

## খংচেন্দজোঙ্গা (কাঞ্চনজঙ্ঘা)



ভারতের সিকিম রাজ্যে অবস্থিত খংচেন্দজোঙ্গা জাতীয় উদ্যান। বিশ্বের তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার নামানুসারে এর নাম রাখা হয়েছে। এটি ১৭৮৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০১ ফুট থেকে ২৮০৫০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। এই উদ্যানে ওক, দেবদারু, বার্চ, ম্যাপেল, উইলো প্রভৃতি বৃক্ষ এবং আলপাইন ঘাস ও গুল্মের পাশাপাশি অনেক ভেষজ উদ্ভিদ রয়েছে। রয়েছে ৫৫০ প্রজাতির পাখি। বন্যপ্রাণী রয়েছে প্রচুর। এই উদ্যানের বাফার জোনের ভেতরে রয়েছে থোলুং মঠ, যা সিকিমের পবিত্র মঠগুলির মধ্যে অন্যতম। এই উদ্যানে শীতকালে ভারী তুষারপাত এবং বর্ষাকালে মে মাসের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হয়।

## এসো সংস্কৃত শিখি-১০১

শীঘ্রম্- মন্দম্। কথম্  
তাড়াতাড়ি - ধীরে। কেমন করে?  
অম্ব্যাসং কুর্ম: -  
হরিণ: শীঘ্রং ধাবতি। গজ: মন্দং চলতি। যুবক:  
শীঘ্রং চলতি। বৃদ্ধ মন্দং চলতি। ধীম শীঘ্রং  
খাদতি। শ্রেয়া শীঘ্রং লিখতি। অন্বেষা শীঘ্রং  
পঠতি। সৌহার্দ: শীঘ্রং বদতি। দীপ্তি শীঘ্রং ধাবতি।  
প্রয়োগং কুর্ম: -  
ক: ক: শীঘ্রং খাদতি? ক: ক: শীঘ্রং চলতি?  
ক: ক: শীঘ্রং বদতি? ক: ক: শীঘ্রং লিখতি?  
ক: ক: শীঘ্রং পঠতি? ক: ক: ধাবতি?  
বাক্যাণি রচয়াম - -  
গজ:, মার্জার:, কুক্কর:, বিমানম্, রেলযানম্,  
দ্বিচক্রিকা, তেজস্বিনী, শাখা:, কচ্ছপ:,  
সৈনিক:।

## ভালো কথা

### আমার বেলুড় মঠ দর্শন

গত মাসে আমি মায়ের সঙ্গে বেলুড়মঠে গিয়েছিলাম। আমি প্রথম বেলুড়মঠ দেখলাম। প্রথমেই আমার মন্দিরে বসে ধ্যান করলাম। যারাই আসছে তারা কোনো কথা না বলে বসে ধ্যান করছেন। ধ্যানের পর আমরা ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। মিউজিয়াম দেখলাম। দুপুরে ওখানেই প্রসাদ পেলাম। ওখানকার রান্নাঘরটি বিশাল। প্রতিদিন অনেক মানুষ প্রসাদ পায়। চারদিকে ফুলের বাগান। গাঁদা, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে। অনেক মালী ফুলগাছের পরিচর্যা করছে। মঠের পাশ দিয়ে গঙ্গানদী বয়ে চলেছে। আমার আরও থাকতে ইচ্ছা করছিল। মা বললেন আর একদিন আমরা আসবো। স্বামীজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বাড়ি চলে এলাম।

শ্রেয়া চক্রবর্তী, বর্ষশ্রেণী, রাণাঘাট, নদীয়া।

তোমার দেখা বা  
তোমার সঙ্গে ঘটা  
এরকম ভালো  
কোনো ঘটনা যদি  
থেকে থাকে  
তাহলে চটপট  
লিখে পাঠাও  
আমাদের  
ঠিকানায়।

## শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) গ ন্দ্র হ চ

(১) ন চ ত্র রি ঠ গ

(২) র ৎ চ কা

(২) না চ ন্দ গ ব র

৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) অষ্টমঙ্গলা (২) আপনভোলা

৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) উড়োজাহাজ (২) উত্তরপত্র

(১) হত্যিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।(২) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা।

(৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯।(৪) পূজা সরদার, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাকুর বিভাগ

স্বস্তিকা

২৭/১বি, বিধান সরণি

কলকাতা - ৭০০ ০০৬

হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা

মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর

ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।



স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব  
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯  
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

**PIONEER**<sup>®</sup>  
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book  
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2590  
Email pioneerpapers@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে  
**SIP** করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

**DRS INVESTMENT** ☎ 8240685206

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

9748978406

NPS | Mutual Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

# বৈষ্ণব সাহিত্য: ঋতুবৈচিত্র্যের মালঞ্চ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. মনাজ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃন্দাবন মানে মধুমালতী ( *\_Quisqualis indica\_* )-র গন্ধে-ভরা হাওয়া, বৃন্দাবনের-কুঞ্জ মানে ফুলের ভাৱে নত মাধবী শাখা ( *\_Hiptage benghalensis\_* )। বসন্তে সে কুঞ্জ রক্ত-রঙা পলাশ ( *Butea monosperma* ) কোলাহল করে ওঠে। গ্রীষ্মে পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া ( *\_Caesalpinia pulcherrima\_* ) ডাক দিয়ে যায়। বর্ষার বাতাসে বিচলিত হয়ে ঘাসের উপর কামিনী ( *\_Murraya exotica\_* ) লুটিয়ে পড়ে। শরতের শিশির-বাতাস শিউলি যুথিকাকে উচ্ছ্বসিত করে যায়। আষাঢ়ের বসন্ত উৎসবে, শ্রীষবনের কিশলয় ছাওয়ায় জুঁহিবেলির গন্ধে অমোচ্য বন্ধনে মিশে আছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি।

বৃন্দাবনে ঋতু উৎসব কেমন? কীভাবেই বা আসে বসন্ত ঋতু, বর্ষা, শরৎ শীত? বৈষ্ণব কবিরা গীতিকবিতার মধ্যে আপন অনুভবে পরিব্যক্ত করেছেন এই ঋতু উৎসব। সেই উৎসবে পুষ্প মঞ্জরীতে ভরে যায় তরুণতা; ফুলে-ফুলে, ডালে ডালে, পাতায় পাতায় ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের ছন্দ।

বিদ্যাপতি লিখেছেন, ‘আওল ঋতুপতি-রাজা বসন্ত।/ ধাওল অলিকুল মাধবী-পস্থ।’ মাধবী লতার ফুলের পথে ধেয়ে গেছে

মৌমাছির দল। বসন্তের সমাগমে জাফরান ফুলের গর্ভকেশর হেমদণ্ডের মতো স্বর্ণাভ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে-‘দিনকর-কিরণ ভেল পয়গণ্ড।/ কেশর- কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড’ কাঞ্চন বৃক্ষের মাথা ফুলে ফুলে ভরে গেছে, যেন কুসুম-ছত্র- ‘নৃপ-আসন নব পাটল-পাত।/ কাঞ্চন-কুসুম ছত্র ধরু মাথ’ আমার মুকুলের গন্ধে ছেয়ে গেছে চারদিক, আর কোকিল গাইছে পঞ্চম স্বরে—‘মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়।/ সমুখি কোকিল পঞ্চম গায়’ জুঁহি-বেল, ফুলের পুষ্পবিন্যাস যেন শ্বেত পতাকার অবয়ব নিয়েছে, অশোকের পাপড়ি যেন ধনুকের বাণ আর পাটল ফুল যেন তুণ-‘কুন্দ-বেলী-তরু ধরল নিশান।/ পাটল তুণ, অশোক-দল বাণ’। শীত চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটেছে পলাশ, আইপোমিয়া তরুণতা—‘কিংশুক লবঙ্গলতা একসঙ্গ।/ হেরি শিশির ঋতু আগে দেল ভঙ্গ’ শীত যাবার ফলে প্রাণ ফিরে পেয়েছে সরোবরের পদ্ম-‘উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ।/ নিজ নবদলে করু আসন দান’।।

জ্ঞানদাস শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করে জানাচ্ছেন শ্যামের স্নেহ যেন রস সাগরের মধ্যে বিকশিত এক পদ্ম-‘সরোবর-সরসিজ শ্যামের নেহা।’ রঙের উৎসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃন্দাবনের যত বৃক্ষলতা লাল বর্ণ ধারণ করেছে-‘ফাগু খেলাইতে

ফাগু উঠিল গগনে। / বৃন্দাবন তরুণতা রাতুল বরণে।।’ বসন্তে লাল ফুল ফোটে পলাশ, শিমূল, আর মান্দার বৃক্ষে। এমনই লাল সেই বর্ণ, যেন ডালে ডালে আগুন জ্বলে (Flame of forest)। পুষ্পপুঞ্জ ঢেকেছে চারদিক, ব্রজবাসীরা তাতে ঢেকেছে আপন তনু। যদুনন্দন দাস লিখেছেন, ‘ফুলবনে দোলায়ে ফুলময় তনু। / ফুলময় আভরণ, করে ফুল ধনু।।/ ফুলময় ক্ষিতিতল, ফুলবন কুঞ্জ।/ ফুলময় সখী বরিখয়ে ফুলপুঞ্জ।।’ বৃন্দাবনে নেমেছে বর্ষা। কদমের ফুল ফুটেছে ডালে ডালে—তঁর সৌগন্ধে ভরেছে কুসুমিত বৃন্দাবন। ফুল ফুটলে আপনিই আসে ভ্রমর, আর ধয়ে আসে মৌমাছি।

কবি নরোত্তম দাসের মনে হয় বৃন্দাবন যেন মনোরথ-পুর। ‘কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল, ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি। পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী।। কুসুমিত বৃন্দাবন কল্প তরুর গণ পরাগে ভরল অলিকুল। রতনে খচিত হেম- মন্দির সুন্দর যেননরোত্তম-মনোরথ-পুর।।’ শরৎ সামগ্রী নিয়ে হাজির হয় শ্যামলিমা। ফোটে জাতী-যুথী, গুঞ্জ; ফোটে কুন্দলতা। কাশের ফুলে ফুলে পৃথিবী শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, যেন শ্বেত চামর। মনোরম শিউলীর পরশ পেতে আসে ভ্রমর। ফোটে রক্তোৎপল, গাঁথা হয় নীলোৎপল মালা।

যদুনন্দন দাস লিখেছেন, ‘জাতী পুষ্প দেখি যুথী ত্যাগ কৈল অলি।/ মুকুপ্রায় জাতীফুলে বিহরএ মেলি।। / প্রবীণ হইল গুঞ্জ শোণ বর্ণ হয়ে। ময়ূরের পাখা সব পড়িল খসিয়ে। / ...কাশীয়ার ফুলে মহী শ্বেতিমা হইল।/ মুক হৈল শিখী সব শব্দ তেয়াগিল।/ ...শেফালিকা- পুষ্প দেখ অতি মনোরম। ভ্রমরা পরশে যবে পড়ে সেই ক্ষণ।।’

শরতে মল্লিকা মালতীর বিকাশ বার্তা জানান দীন চণ্ডীদাস, জানান গোবিন্দদাসও। শরত-যামিনীতে বিবিধ ফুল ফোটার কথা লিখেছেন বলরামদাস। ‘শরদ-চন্দ্র, পবন মন্দ,/ বিপিনে ভরল কুসুম-গন্ধ,/ ফুল্ল মল্লিকা মালতী যুথি,/ মত্ত মধুকর ভোরণি।’ (গোবিন্দদাস)। ‘একে সে মোহন যমুনাকুল,/ আরে সে কেলি-কদম্ব-মূল,/ আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল, / আর সে শরদ যামিনী।’ (বলরামদাস)। বৃন্দাবনে আসে শীত। কুন্দ গাছে ভরে যায় সাদা ফুলে, যেন শ্বেত-অঙ্গু। যদু-নন্দন দাস লিখেছেন,



কৃষ্ণচূড়া



নাগেশ্বর



রক্ত কাঞ্চন

‘প্রফুল্লিত কুন্দ দেখ শ্বেত অঙ্গু ধরে।/ হরিতাল ভারই শব্দে স্তবন যে করে।।’

বৈষ্ণব-মহাজন-গীতিকায় দেখা যায় মালতীর ফুল গেঁথে মালা তৈরী করে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের জন্য অপেক্ষা করেন। নরোত্তম দাস লিখেছেন, ‘এ নব মালতীমালা বৃথাই গাঁথিলু গো, / কেমনে রজনী গোঙাইব।।’ মালা গাঁথার ফুল হিসাবে মল্লিকাও অনবদ্য। কবি শেখর লিখেছেন, ‘রোপিনু মল্লিকা নিজ করে/ গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে। মিলন-শয্যা প্রস্তুতে শিরিষ ফুলের ব্যবহার চোখে পড়ে। শয্যাপুষ্প রূপে কুঞ্জ গৃহে পদ্ম এবং শিউলি বা শেফালিও ব্যবহৃত হয়। ‘রক্তোৎপল ইন্দীবর উপাধান কৈলা।/ কুঞ্জগৃহে শয্যা পুষ্প শেফালী

পাড়িলা।।’ অজ্ঞাত এক কবি লিখেছেন, ‘শিরিষ-কুসুমে শেজ বিছান্ডাই / কাম-শরে অগেয়ান।’ যদুনন্দন দাস লিখেছেন, ‘অঙ্গনা সোহিতে অলঙ্কারের কারণ।/ জাতি পুষ্প দেই আর কৈরবাদিগণ।।’

বৈষ্ণব গীতাঞ্জলির উপাদান-বিশ্লেষণ (Content Analysis) করলে দেখা যাবে বারে বারে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এসেছে নানান ফুল, লতা, গুল্ম, বৃক্ষের কথা। এমনকী সোনার বরণ অতসী ফুলও। বিদ্যাপতি লিখেছেন অতসী ফুলের অনবদ্য সৌন্দর্যের কথা। এমন সৌন্দর্য যে ফুলে, না জানি তাঁর ফলটি কেমন! চারা লাগিয়ে তাই দুধ ঢালা হল। ‘কাঞ্চন-কুসুম-জোতি পরকাশ/ রতন ফলিবে বলি বাঢ়াইয়লু আশ।।/ তাকর মূলে দিলু দুধক ধার। / ফলে কিছু না হেরিয়া বনবনি সার।।’ কিন্তু দেখা গেল ফল পেকে শুকালে তার শূঁটিতে বীজ বনবান করছে। কবি মুরারী গুপ্ত লিখেছেন জল ছাড়া পদ্ম চাষ অসম্ভব- ‘তার সান্ধী পদ্ম ভানু জল ছাড়া তার তনু / শুখাইলে পিরিতি না রয়।।’

প্রস্তুত প্রবন্ধের শেষে কয়েকটি কৃষ্ণ-তরু ও গুল্ম লতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

‘কৃষ্ণচূড়া’ নামে বাংলায় যে গাছটি পরিচয় তার ল্যাটিন নাম Caesalpinia pulcherrima। এটি একটি গুল্ম এবং ফ্যাবেসী পরিবার ভুক্ত। এর পাতা ফার্নের মতো এবং ফুলের গোছা সতিই কৃষ্ণের চূড়ার মতো সজ্জিত। অনেকে অবশ্য গুলমোহরকে কৃষ্ণচূড়া নামে চেনেন। গুলমোহর কিন্তু গুল্ম নয়, বৃহৎ বৃক্ষ, ল্যাটিন নাম Delonix regia। কিন্তু গাছটি কৃষ্ণচূড়ার মতই ফ্যাবেসী পরিবারের অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে গুলমোহরে লাল ফুলে ভরে যায়, তাই এর নাম ‘Flame tree’।

একইভাবে ফ্যাবেসী পরিবারের অন্তর্গত একটি বৃহৎবৃক্ষ Peltophorum pterocarpum - কে অনেকে ‘রাধাচূড়া’ বলে থাকেন। ইংরাজিতে এর নাম ‘Yellow Flame tree’। এর ফুল ফোটে গ্রীষ্মে, ফুলের রং হলুদ। রাধাচূড়া কিন্তু কৃষ্ণচূড়ার মতই গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। ফুলের থোকা দেখলে মনে হবে সতিই যেন রাধার মাথার চূড়া। ল্যাটিন নাম Caesalpinia gilliesii - ইংরাজিতে কেউ বলেন ‘Bird of Paradise’। অবশ্য এই নামে অনেক ফুল আছে।

কৃষ্ণ বট (Krishna Fig– Krishna Butter Cup) নামে একটি বিশেষ ধরনের বটগাছ কৃষ্ণ মিথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মোরেসী পরিবারের এই গাছটির ল্যাটিন নাম হচ্ছে *Ficus\_benghalensis\_var\_krishnae* বা *Ficus\_krishnae*। এর পাতার গোড়ায় পকেটের মতো খাঁজ চোখে পড়ে। কৃষ্ণ ও অন্যান্য গোপ বালকেরা নাকি এই পাতার পাত্রে (Makhan Katori) করে ক্ষীর ননী চুরি করে এনে খেতেন। বৃন্দাবনবাসীদের বিশ্বাস, সাধারণ বটপাতা মুড়িয়েই ক্ষীর ননী খাওয়া হতো। তারপর মোড়ানো পাতা ছুড়ে ফেলতে, তা থেকে জন্ম নিল নতুন বটগাছ। সেই বটগাছের পাতা মোড়ানো আর ক্ষীর-ননী খাওয়াও সহজ। কৃষ্ণ পুরাণ জড়িত থাকায় ল্যাটিন নামে ‘Krishnae’ কথাটা সংযুক্ত হয়েছে।



শিমুল

কৃষ্ণ নামের সঙ্গে বৃন্দাবনের তাল তমাল গাছ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। পাম গোত্রের *Borassus\_flabellifer* বা Asian Palmyra Plum- ই হচ্ছে তাল। এই তালের পাতাও বিশেষ পদ্ধতিতে মুড়িয়ে খাবারের পাত্র হিসাবে থামবাস্কলায় এবং ভারতের অন্যত্র ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পাকা তালের রস দিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত বড়া কৃষ্ণপূজার অন্যতম নৈবেদ্য। কেউ কেউ বলেন তমাল গাছ আসলে তেজপাতা (Indian bay leaf)। কারণ এই উদ্ভিদটির ল্যাটিন নাম *Cinnamomum\_tamala* যা লরেসী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আবার কেউ বলেন তমাল হচ্ছে ভেষজ বৃক্ষ *Garcinia\_xanthochymus* বা *Garcinia\_mangostana* যার ইংরাজি নাম ‘Mangosteen’। এটি একটি চিরহরিৎ, মাঝারি থেকে বৃহৎ বৃক্ষ, ফুলের রং সাদা এবং ফল পাকলে হলদে। বসন্তে ফুল আসে এবং ফল পাকে গ্রীষ্মে। ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থায় এই ফলটি এবং তার বীজ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রান্তীয়, চিরহরিৎ বৃক্ষ কদম বৃন্দাবনের অন্যতম পবিত্র তরু। এর ল্যাটিন নাম *Neolamarckia\_cadamba*, এটি রুবিয়েসী পরিবারের অন্তর্গত। এই ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ, বলের মতো আকার, ফুলের রং লাল থেকে কমলা। ৪ থেকে ৫ বছরের গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। কৃষ্ণ কথায় কদমের প্রসঙ্গ আসে বারে বারে। তারই ছায়ায় রাধাকৃষ্ণের যুগলবন্দি, কৃষ্ণ বাঁশি বাজান কদম গাছের তলায়।



গামারি

মাধবীলতা ( *Hiptage\_benghalensis* ) কৃষ্ণকাহিনিতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। ম্যালপিজিয়েসী পরিবারভুক্ত এই বৃহৎ লতাটি বহুবর্ষজীবী। বহু বৈষ্ণব প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র এই লতাটিকে ব্যবহার করে তৈরি করা হয় মালধের কুঞ্জ। বহু বহু বছরের পুরনো কাঠল লতাটিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয় বিশেষ অবলম্বন (Support) ব্যবহার করে। এর পাতা ভল্লাকার বা ডিম-ভল্লাকার, প্রায় ২০ সেমি লম্বা। বছরের মাঝে মাঝেই ফুল ফোটে, মিষ্টি তার গন্ধ। একটি থোকায় প্রায় ১০ থেকে ৩০টি ফুল ফোটে। ফুলের রং গোলাপি-সাদা, সঙ্গে হলুদের আভা। কিংগুক বা পলাশের প্রসঙ্গ এসেছে বারে বারে। ইংরাজিতে এর নাম ‘Parrot Tree’, ল্যাটিন নাম *Butea\_monosperma*। এটি প্যাপিলিওনেসী পরিবারভুক্ত। এছাড়া অশোক ( *Saraca\_indica* ) আম ( *Mangifera\_indica* ), শিরীষ ( *Albizia\_lebek* ), চম্পক বা চাঁপা ( *Michelia\_champaca* ), ইত্যাদি ফুলের নাম পাওয়া যাচ্ছে।



মহুয়া

বৈষ্ণব-মহাজন-গীতিকা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। এই গীতাঞ্জলির মধ্যে মুক্তি পেয়েছে — প্রেমার্দহৃদয়ের ভাব-অনুভব, আত্মপ্রকাশ করেছে শ্যামল শোভা। বংশীবট, গুঞ্জাফুল, তমালতরু, অশোকবন, পলাশকুঞ্জ, মাধবীমঞ্জরি, মধুমালতী, শিরীষ কুসুম, আম্র বীথিকা, জুঁহিবেলি, সরসিজ-সরোবর, কদম্ব তরু, কাঞ্চন কুসুম, লবঙ্গলতা, কুন্দলতা, শেফালিকা, কাশিয়ার ফুল, মল্লিকা প্রভৃতির সৌকর্যে-সৌগন্ধে যেন মাতোয়ারা বৈষ্ণব গীতাঞ্জলি বর্ণিত পুষ্পোদ্যান। শ্রীরাধিকার প্রেম পুষ্প সাহচর্যে, পুষ্প-বনে, কুসুম-সুগন্ধে বিকশিত হয়ে প্রাণের আনন্দরূপের সঙ্গে মিলেছে। বৃন্দাবনের কুঞ্জ-লতার শাখায় শাখায়, ফুলে-ফলে-পল্লবে অনুভূত হয় ঋতু-উৎসব এবং কৃষ্ণ ও রাধার আত্ম নিবেদন।



পারিজাত/মান্দার

‘ক্ষণিকা’ কাব্যগ্রন্থের ‘জন্মান্তর’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘যদি ননি ছানার গাঁয়ে /কোথাও অশোক-নীপের ছায়ে/আমি কোনো জন্মে পারি হতে/ব্রজের গোপবালক...’ সেখানে নীল যমুনার কুলে বৃন্দাবনের গোষ্ঠে গোষ্ঠে গোকুলের রেণু উড়িয়ে নিত্য ধেনু চরায় ব্রজের রাখাল। তাঁদের গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা। বংশীবটের তলে বসে তারা শ্যামের বাঁশি শোনে। এমন সময় শাওন মেঘের ছায়া এসে তমাল-মূলকে করে তোলে কৃষ্ণ কালো। আর তখনই কুঞ্জবনে ময়ূর নাচে পুচ্ছ তুলে — সে এক অপরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য। এমন সুযোগ যদি পরজন্মে পাই তবে নিজের ঘরে সভ্যতার আলো নিবিয়ে দেব।



পলাশ

তথ্যসূত্র : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৬৫) সম্পাদিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন গীতিকা, দেব সাহিত্য কুটীর, কলকাতা।



কাঠ গোলাপ

# খিলাফত আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না

## ড. অমলেশ মিশ্র

আরবি ভাষায় ‘খলিফা’ শব্দের অর্থ হলো — আল্লাহর প্রতিনিধি অথবা রসুলের উত্তরাধিকারী (Successor of Prophet)। ইংরেজি ভাষায় বলা হয়— Caliph অথবা Calif.

খলিফা হলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের পার্থিব জগতের বিষয়ের প্রধান। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে রসুল মহম্মদের মৃত্যুর পর এই শব্দটি চালু ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রসুল মহম্মদের মৃত্যুর পর তার বন্ধু তথা শিষ্য আবু বকর হলেন প্রথম খলিফা। প্রথম চার জন খলিফা পরপর — আবু বকর, ওমর, ওসমান ও আলি। মুসলমান সম্প্রদায়ের যারা সুন্নি শ্রেণীভুক্ত, তারা মনে করেন যে মহম্মদের পরে এই চারজনই সঠিক পথের খলিফা। এই খলিফা উপাধি পরে উত্তরাধিকার সূত্রে চলতে থাকে। দামাস্কাস ও কর্ডোবায় উমাইয়াদ সম্প্রদায় এই পদবি ব্যবহার করত। আব্বাসিদরা বাগদাদে এই পদবি ব্যবহার করত, মিশরে ফতিবিদ ও মামলুকরা এই পদবি ব্যবহার করত।

১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে অটোমান সুলতানরা কায়রো (মিশর) দখল করে। পরে ১৯২৪ সালে যখন তুর্কি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো — তখন সরকার এই পদবি অবলুপ্ত করল। কিন্তু প্রকৃত খলিফা কে তা নিয়ে মতান্তর সুন্নি ও শিয়া এই দুই দলের মূলে আছে। ভারতের মুসলমানরা খলিফা পদকে সম্মানের সঙ্গে মেনেই চলত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতে ইসলাম সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল জামালউদ্দিন আল আফগানি (১৮৩৯-১৮৯৭) ছিল যার স্রষ্টা। তিনি এই শতাব্দীতে মুসলমান জগতের এক বিখ্যাত ব্যক্তি। তার আন্দোলন ছিল মুসলমান সমাজকে ইউরোপীয় প্রভাব ও শোষণ থেকে মুক্ত করার। এছাড়াও আফগানি বিশ্বের মুসলমান শাসিত দেশগুলিকে একজন খলিফার অধীনে ও নেতৃত্বে আনতে চেয়েছিল যার দ্বারা বিশ্বে একটি ইসলামি উম্মা বা খিলাফত তৈরি করা যায়। ভারতীয় হিন্দু নেতাদের ধারণা যে ভারতে হিন্দু-মুসলমান বৈরিতার স্রষ্টা এই জামালউদ্দিন আল আফগানি। তিনি ছিলেন একজন আফগান। (মহাভারতের যুগ থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত আফগানিস্তান ৮২২ খ্রিস্টাব্দে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়)। ১৮৮০-৮১ নাগাদ জামালউদ্দিন ভারতে এসেছিলেন আফগানিস্তান থেকে। তাকে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ Pan Islamism-এর জনক বলা হয়। ভারতে এসে তিনি মুসলমান নেতাদের সঙ্গে গোপন বৈঠকও করেছিলেন। কলকাতায় এসে নবাব আবদুল লতিফও শিক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গে বৈঠকও করেন। এঁদের মধ্যে বিচারপতি সৈয়দ আমির আলিও ছিলেন। ইসলামি খিলাফতের বিষয় তিনি এই সব শিক্ষিতদের মধ্যে ইনজেকশন করেছিলেন। তার আগে মুসলমানরা বিশেষ করে বঙ্গে, হিন্দুদের সঙ্গে একত্র হয়েই যাবতীয় জাতীয় স্বার্থের কাজে যুক্ত হতেন। কিন্তু জামালউদ্দিনের কলকাতা ভ্রমণের পরে

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে — যা মুসলিম লিগ গঠিত (১৯০৬) হওয়ার পর আরও বড় ফাটল তৈরি করেছিল।

খিলাফতের ধারণার প্রভাব ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপর কীভাবে পড়েছিল তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যখন হান্টার কমিশনের কাছে মুসলমান নেতারা ডেপুটেশন দিয়ে জানালেন যে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিকে মুসলমান ছাত্ররা বাংলা নয়, উর্দু পড়বে ও শিখবে। জানবার কথা যে ওই সময় বঙ্গের ৯৯ শতাংশ মানুষ উর্দু কী তা জানতই না।

শিয়া মুসলমান নেতা আগা খাঁ-র মত হলো— ভারতীয় মুসলমানরা নিজেদের বিশ্ব মুসলমান ভ্রাতৃত্বের একজন সদস্য বলে মনে করত।

বিষয়টা ব্রিটিশ শাসকদের নজর এড়ায়নি। ১৮৯৭ সালে ইংলন্ডের সেক্রেটারি অফ স্টেটস ভারতের ভাইসরয় এলগিনকে (৩০ জুলাই) লিখলেন — We have, however, a new element of intrigue and commotion introduced in India by the Pan Islamic Council in Constantinople and the close connection which is being established between the Sultan and Indian Mohammedans.

অর্থাৎ আমাদের একটি নতুন ঝামেলায় জড়াতে হচ্ছে। কনস্টান্টিনোপলের সুলতানের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।

ইতিহাস বলছে, ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে পৃথক রাস্তা বেছে নিয়েছিল। হিন্দুরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে সবদিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় রত, তখন মুসলমানরা তীব্র সাম্প্রদায়িক ও জেহাদি আন্দোলনে উৎসাহিত হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ ঘটেছিল। যার বিবরণ এই পরিসরে অবাস্তর।

গান্ধী ১৯২০ থেকে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশদের উপর বিরাট চাপ দিচ্ছিল যাতে ব্রিটিশরা তুরস্ক নীতির পরিবর্তন করে। এটিই খিলাফত আন্দোলন নামে পরিচিত হয়। গান্ধী এ বিষয়ে মুসলমানদের সমর্থন করলেন। মুসলমানদের বক্তব্য ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে ব্রিটিশরা ভারতীয় মুসলমানদের কথা দিয়েছিল যে তুরস্কতে খলিফা থাকবেন। মোহনদাস গান্ধী মুসলমানদের শুধু সমর্থন করলেন তাই নয়, আরও বুঝিয়ে দিলেন যে হোমরুল আন্দোলনের গুরুত্বের থেকে খিলাফত আন্দোলনের গুরুত্ব কম নয়। তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ২৪ নভেম্বর ১৯১৯, দিল্লিতে যখন সারা ভারত খিলাফত সম্মেলন হচ্ছে— গান্ধী হলেন সেই সম্মেলনের সভাপতি। তিনি বললেন যে মুসলমানদের পক্ষে সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা যদি ব্রিটিশরা না নেয়

তাহলে বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলন হবে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের সম্মেলনে এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানান হলো।

এই পশ্চাদভূমির উপরেই গান্ধীজী ভারতে খিলাফত আন্দোলন তৈরি করেন। ব্রিটিশরা কথার খেলাপ করেছে। তাই তিনি খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। এই আন্দোলনের পদ্ধতি ছিল— হিন্দুদের ওপর জেহাদি আক্রমণ। খিলাফতি মোপলা জেহাদিদের হাতে কেবলমাত্র সংঘটিত হয় হিন্দু নরসংহার। যদিও জেহাদি কার্যকলাপগুলিকে ‘অসহযোগ আন্দোলন’ আখ্যা দিয়ে মুসলমান তোষণের বেড়া জালে আড়াল করা হয়।

এই আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো সংযোগই ছিল না। তদানীন্তন সময়ে গান্ধীজীর প্রধান সহযোগী ছিলেন মহম্মদ আলি ও তার ভাই সওকত আলি। এই আন্দোলনে মার খেয়েছিলেন, অত্যাচারিত হয়ে ছিলেন হিন্দুরাই। কারণ এর সঙ্গে ‘স্বাধীনতা’ কথাটা যুক্ত করেছিলেন গান্ধী।

মুসলমানদের গান্ধীজী সম্পর্কে সামান্য মোহও ছিল না। আবার গান্ধীজী মুসলমানদের নেতৃত্ব পাওয়ার লোভে তাদের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে কংগ্রেস থেকে তাড়াতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই যুগে জিন্না ছিলেন ভারতপ্রেমী মুসলমান। মুসলিম লিগ তাঁকে সদস্য করতে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লিগের সদস্যতা গ্রহণ করেন। এই সর্তেয়ে ভারতের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলে তিনি লিগ ত্যাগ করবেন। এই একান্ত ভারতপ্রেমী ও একান্ত অসাম্প্রদায়িক মানুষটি ১৯৩৬ সাল থেকে ভারত বিরোধী হয়ে যান নেহরু ও গান্ধীর দোষে। এটি একটি পৃথক ইতিহাস — যার বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া গেল না।

জিন্না ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের তীব্র বিরোধী। গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলন করতে গিয়ে জিন্নাকে মুসলমান নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দিয়ে মহম্মদ আলি ও সওকত আলিদের মুসলমান নেতা বানালেন। এর আগে তিনি কংগ্রেসের দখল নিয়েছিলেন নাগপুর কংগ্রেসে (১৯২০) ১৪,৬০০ মুসলমান প্রতিনিধি সংগ্রহ করে।

খিলাফত আন্দোলন স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হলো আর নির্যাতিত হলেন হিন্দুরা। যে দাবিগুলির ভিত্তিতে এই আন্দোলন হয়েছিল তার শেষ নম্বরে ছিল ভারতের স্বাধীনতা— যে বিষয়ে গান্ধীজী বিন্দুমাত্র আগ্রহান্বিত ছিলেন না যা তাঁর আত্মচরিত— *The Story of My Experiments with Truth* থেকেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়। তিনি ছিলেন ইংরেজভক্ত।

খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজী তিনটি স্লোগান বা ধ্বনি দিলেন— আল্লাহ আকবর, বন্দে মাতরম এবং হিন্দু মুসলমান কী জয়।

গান্ধীজী সৃষ্ট এই মুসলমান নেতা মহম্মদ আলি খিলাফত ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধী সম্পর্কে বলেছিলেন— আমার মজহব (কোরান) অনুসারে যে কোনো হিন্দুই যে কোনো অধঃপতিত মুসলমানের থেকেও নিকৃষ্ট সে যদি গান্ধীও হয়।

খিলাফত ব্যর্থ হওয়ার পরে পরেই দক্ষিণ ভারতের মুসলমান মোপলারা নৃশংস হিন্দু হত্যা শুরু করে। যার বিশদ বিবরণ যে কোনো

হিন্দুর পক্ষে সম্পূর্ণ পড়ে ওঠা সম্ভব নয় কিন্তু গান্ধীজী বললেন— ‘সাহসী ধর্মভীরু মোপলারা যা ধর্ম বলে মনে করে এবং ধর্মের জন্য যে লড়াই করা সঙ্গত সেই ভাবেই লড়াই করেছিল।’ যেমন জীবন্ত হিন্দুদের ছাল ছাড়ানো।

অসহযোগ আন্দোলন কোনো হিসাবেই স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল না। এটি ছিল হিন্দু নির্যাতন ও হত্যার জন্য ইংরেজ ও মুসলমানদের হিন্দু হত্যার শৈলী এবং গান্ধীর মুসলমান নেতৃত্বে যাওয়ার এক কৌশল। খিলাফত আন্দোলনের সূচি অনুমোদিত করার উদ্দেশ্যে নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধী ১৪,০০০ মুসলমান নিয়ে গিয়েছিলেন। মুখ্য নেতারা কেউই সমর্থন না করলেও তিনি তা পাশ করিয়ে নিলেন।

খিলাফত আন্দোলন বিরোধীরা বলেছিলেন তুরস্ক খিলাফত চাইলে বা না চাইলে ভারতীয়দের লাভ বা লোকসান হয় না। এটি মুসলমান আধিপত্যের সংগ্রাম। এতে ভারতীয়দের কোনো লাভ নাই, কারণ এটি মুসলমান সাম্রাজ্যবাদ।

গান্ধীজী যখন খিলাফত সমর্থন করার জন্য জিন্নাকে চিঠি দিলেন তার উত্তরে জিন্না লিখেছিলেন— আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু আপনি যে ‘New Life’-এর কথা বলেছেন— তার পদ্ধতি ও কর্মসূচি নিয়েছেন তা বিপদ (disaster) আনবে। আপনি হিন্দু-মুসলমানে লড়াই বাধাচ্ছেন শুধু নয়, পিতা-পুত্রের মধ্যেও লড়াই তৈরি করেছেন। স্বাধীনতার জন্য মানুষ তৈরি। আপনার পরিকল্পনা কেবলমাত্র অনভিজ্ঞ যুবারা আর অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষরই উল্লাসিত হবে।

তিলকের ঘোরতর বিরোধী গান্ধী, কিন্তু তাঁর জনপ্রিয়তা যে গভীর ছিল, গান্ধী তা বুঝেছিলেন। তাই তাঁর নামে— ‘তিলক মেমোরিয়াল স্বরাজ ফান্ড’ নামে অর্থ সংগ্রহের একটি ব্যবস্থা করলেন। লক্ষ্য ১ কোটি টাকা (এখনকার হিসাবে ১২০০ কোটি) টাকা উঠল কিন্তু হিসাব পাওয়া গেল না। জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ করার রাজনীতির উদ্বোধন হলো। গান্ধীজী বিনাযুদ্ধে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন। খিলাফত আন্দোলন করে মুসলমান নেতা জিন্না যাকে *Ambassador of Hindu-Muslim Unity* বলা হতো, তার থেকে মুসলমান নেতৃত্বও কেড়ে নিলেন গান্ধী। ভারতবর্ষে মুসলমান তোষণ নীতির জন্ম হলো।

ইসলামি মজহবকে গান্ধী বরাবরই রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। জিন্না বিশ্বাস করতেন মজহব ব্যক্তি বিশেষের, একে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করা ঠিক নয়। ১৯৩৭ সালের পরে জিন্না মজহবের ভিত্তিতে রাজনীতি শুরু করেন।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (নিরীহ জমায়েতের উপর ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালিয়ে ১০০০-১২০০ জনকে হত্যা) ঘটেছিল ১৩ এপ্রিল ১৯১৯।

ওই বছরের ৩০ মে গান্ধীজী বড়লাট চেমসফোর্ড লিখেছিলেন— আমি সামরিক আইনকে নিন্দা করতে রাজি নই। ওখানকার অত্যাচারী প্রশাসনের কাজ থেকে আমি এ সিদ্ধান্ত করতে পারিনা যে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপগুলি তাড়নামূলক। □



## সঙ্ঘের আহ্বানে বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে সমগ্র বিশ্ব

প্রদীপ মারিক

এত বছর ধরে যেভাবে তালিবানপন্থী বাংলাদেশি মোল্লাবাদীরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছে তা শুধু অমানবিক নয় তা ভাবনারও অতীত। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বের প্রত্যেকটি ভাষাভাষী মানুষদের বাংলাদেশি মোল্লাবাদীদের ওপর রাগের অগ্নিশিখা জ্বলছে। তবু সবাই চুপ করে আছে, ধৈর্য ধরছে এই অরাজকতা যেন বন্ধ হয়, বাংলাদেশে যেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৪ সালে আগস্ট মাসে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকেই বাংলাদেশে অস্থিরতা চলছে। গত বছরের ডিসেম্বরে জেহাদি ছাত্রনেতা ওসমান হাদিকে হত্যার পর থেকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে গণতাণ্ডবের ঘটনা বেড়েছে। গণপিটুনির ঘটনায় দীপুচন্দ্র দাসের মতো বেশ কয়েকজন হিন্দু যুবক নিহত হয়েছেন। এছাড়াও সেদেশে বহু নিহতদের মধ্যে ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও শিক্ষার্থী রয়েছেন। রাস্তায় বিক্ষোভের সময় বহু ক্ষেত্রে সেদেশে মব-হামলা চালানো হয়েছিল যা সংখ্যালঘুদের উপর সংগঠিত আক্রমণে পরিণত হয়েছিল।

মুম্বইয়ের ওরলির নেহরু সেন্টারে সঙ্ঘের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন, বাংলাদেশে প্রায় ১.২৫ কোটি হিন্দু রয়েছেন। যদি তাঁরা সেখানে থেকে লাড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সারা বিশ্বের সব হিন্দু তাদের সাহায্য করবেন। এই বার্তা মূলত বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মোল্লাবাদীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতও জনগণকে ‘অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করে পুলিশকে রিপোর্ট করার’ আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পূর্বতন সরকার দেশের জনসংখ্যা, বাড়ন্ত অনুপ্রবেশ নিয়ে মাথাই ঘামায়নি। সেই কারণেই ডেমোগ্রাফি এতটা বদলে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সরকার প্রতিটি বিষয় নিয়ে তৎপর। তাঁরা কাজ শুরু করেছে। সফলও হবে। হুঁশিয়ারির সুর চড়া করে তিনি বলেন, ‘ভারতকে এখন আর ভাঙা যাবে না। যারা

ভারতকে ভাঙার চেষ্টা করবে, তারাই ভেঙে যাবে।’

হিন্দুত্ব হলো একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হলো সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। একটি জীবনদর্শন। ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হলো বিশ্বের বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথম শাখা বিজয়াদশমী অর্থাৎ দেশের দিনে স্থাপন করা হয়েছিল। দিনটি ছিল ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫ সাল। দেশেরা উপলক্ষ্যে ডাঃ কেশবরাও বলিরাম হেডগেওয়ার নাগপুরের মোহিতওয়াদা নামে একটি জায়গায় সঙ্ঘের শাখা স্থাপন করেছিলেন। প্রথম ছিল পাঁচজন। এখন সারা দেশে স্বয়ংসেবকের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। মেরিয়াম-ওয়েবস্টারের এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন্স অনুসারে, হিন্দুত্ব হলো ‘ভারতীয় জীবনদর্শনের এক সম্যক ধারণা। হিন্দুত্ব শব্দটি ভৌগোলিকভাবে সাংস্কৃতিক ও জাতীয় পরিচয়কে সংগঠিত করে একজন সত্যিকারের ভারতীয় পরিচয় বহন করে। স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, ‘আজ আমি গর্বের সঙ্গে বলতে চাই যে, ১০০ বছর আগে একটি সংগঠনের জন্ম হয়েছিল যার নাম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। ‘ব্যক্তি নির্মাণ সে রাষ্ট্র নির্মাণ’ অর্থাৎ ব্যক্তি গঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্র গঠন এই সংকল্প নিয়ে এবং ‘মা ভারতী’-র কল্যাণের উদ্দেশ্যে স্বয়ংসেবকরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

তাই এক অর্থে, সঙ্ঘ হলো রাষ্ট্র সাধনায় ব্রতী বৃহত্তম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এর পিছনে রয়েছে ১০০ বছরের আত্মনিবেদনের ইতিহাস। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রত্যেকটি স্বয়ংসেবক হিন্দুত্বের হীরের টুকরো।

বাংলাদেশে হিন্দুদের আজ জেগে উঠতে হবে। তাদের পাশে রয়েছে সারা বিশ্ব। সরসঙ্ঘচালকের এই বার্তায় ভয়েই ভুলুষ্ঠিত হয়ে যাবে বাংলাদেশি উগ্রবাদী মোল্লাবাদীরা। এই সুযোগে হিন্দুদের প্রতিবাদের ভাষায় জেগে উঠুক বাংলাদেশ। সঙ্ঘই বিশ্বে পরধর্ম সহিষ্ণুতার বার্তা দেয়। সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ব হিন্দুত্বের বার্তা বাহক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। □

## আবার ভাঁওতার ভাতা বেকাররা ভাতা চায় না, রোজগারের ভাত চায়

বিশ্বপ্রিয় দাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সম্প্রতি একটি প্রকল্প চালু করেছে। নাম দেওয়া হয়েছে যুবসার্থী। আবারও একটি রাজ্যের লক্ষ লক্ষ কর্মহীন যুবককে অসম্মান করার একটি রাস্তা নিল রাজ্যের সরকার। এর আগে ক্ষমতায় এসে ২০১২ সাল নাগাদ রাজ্য সরকার ভাঁওতা দিয়েছিল, বেকারদের নাম নথিভুক্ত করে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক নামে একটি প্রকল্প চালু করেছিল। লক্ষ লক্ষ বেকার একটা কর্মসংস্থানের আশায় নাম লিখিয়েছিল সেখানে। সেখান থেকে কতজনের চাকরি হয়েছিল আজ পর্যন্ত তা জানা যায়নি। যেমন জানা যায়নি কত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর পরেই ২০১৩ সালে এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকের অধীনেই কর্মহীন নথিভুক্ত বেকারদের জন্য একটি প্রকল্প চালু করা হয়। সেখানেও ১৫০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেবার বিষয়টি বলা হয়। সেই সময় মোড়ক ছিল যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদান। কারা পাবেন এই সহায়তা? যাদের কিনা নাম নথিভুক্ত থাকবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংকে। আর থাকতে হবে নির্দিষ্ট কিছু যোগ্যতা। এবার সেই বেকার যুবকদের জন্য আবার একটি অসম্মানের প্রকল্প— যুবসার্থী। যেখানে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। বেকার হতে হবে। একটি নির্ধারিত ফর্মে নিজেদের সমস্ত বিবরণ দিয়ে আবেদন করতে হবে। যতদিন তারা চাকরি খুঁজবেন, ততদিন (৫ বছর) পর্যন্ত পাবেন। বয়সের সীমা ২১ থেকে ৪০ বছর।

রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকারকে নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার অধিকার কে দিল সরকারকে? সে প্রশ্ন উঠেছে নানা মহলে। যেখানে গত প্রায় ১৫ বছরে রাজ্য সরকার গালভারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং তাদের মন্ত্রী থেকে নেতা সবাই। সেখানে এভাবে আরও একবার ভাঁওতা দেবার প্রকল্প সরকার নিয়েছে। প্রথমে ঘোষণা ছিল, ২০২৬ সালের ১৫ আগস্ট চালু হবে। পরে ভোটের দিকে তাকিয়ে নতুন প্রজন্মকে নিজেদের দিকে টানতে একটা টোপ দেওয়া হলো। এই প্রকল্প নেবার আগে একবার কি ভাবা



সবাই চান একটা  
কর্মসংস্থান হোক এই  
রাজ্যে। ভাতা নয়।  
পাতে রোজগারের ভাত  
পড়ুক। মাথায়  
রোজগারের ছাদ হোক,  
পরনে রোজগারের  
পোশাক উঠুক।

হয়েছিল চাকরি হারা শিক্ষকদের কথা, ভাবা হয়েছে কি গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি চাকরি হারাদের কথা? ভাবা হয়েছিল কি অন্য রাজ্যে চলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীর কথা? যারা এই রাজ্যে কোনো কাজের সুযোগ না পেয়ে চলে যাচ্ছেন অন্য কোথাও? সেই সব মেধাকে কি কেনা যাবে ১৫০০ টাকায়?

এবার আসা যাক বেকারদের কথায়। আবেদন করার জন্য লক্ষ লক্ষ বেকার লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। তারা কি একবার ভেবে দেখেছেন সরকার এই নথিভুক্ত বেকারদের জন্য কিছুই করবে না! শুধুমাত্র ১৫০০ টাকা ভিক্ষা দিয়ে বেকারদের মুখ বন্ধ করার একটা কৌশল এই যুবসার্থী। লক্ষ লক্ষ বেকার চাকরিপ্রার্থী হবার সুযোগ থেকে বাদ দেবার একটা পন্থা মাত্র। যেভাবে আগেরগুলোতে হয়েছে। এভাবে শিক্ষিত কর্মহীন বেকার যুবকদের বারে বারে অপমান করা হচ্ছে। আর এটা রাজ্য সরকারের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এই যুবসার্থী একজন বেকার যুবক পাবেন কতদিন, যার বয়সের উর্ধ্বসীমা ৪০ বছর? তিনি তো আর সরকারি চাকরি পাবেন না। ৪৫ বছরেই সরকারের দায় শেষ। ২০১১ সালে যখন এই সরকার ক্ষমতায় আসে তখন তার বয়স ২৫। এখন ৪০ বছর। ১৫ বছরে বেকারত্বের জ্বালা ভোগ করার পর এই ভিক্ষায় কি তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়াবে? এই প্রশ্ন উঠছে বারে বারে। বেকার ছেলের মা-বাবা কী বলছেন? যিনি বেকার তিনি কী বলছেন? বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে রাজ্যের মানুষ এসব শুনেছেন। কেন এই রাজ্যের মানুষ পরিযায়ী হয়ে একটা কাজের জন্য অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছেন, তার কারণও রাজ্যের মানুষ জানেন। সবাই চাইছেন একটা কর্মসংস্থান হোক এই রাজ্যে। ভাতা নয়। পাতে রোজগারের ভাত পড়ুক। মাথায় রোজগারের ছাদ হোক, পরনে রোজগারের পোশাক উঠুক। খেটে রোজগারের জায়গা চায় এই রাজ্যের বেকার যুবকরা। তাঁরা ভাতার ভাঁওতা চান না। □

(৬৩)

হতাশা

বেশ হতাশই হলেন ডাঃ কেশববলিরাম হেডগেওয়ার। পূর্ব আশঙ্কা থাকলেও এমন উচ্চ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ সমিতির সমবেত অভিমত পুরো নাকচ হয়ে যাবে এতটা হয়তো তিনি ভাবেননি। অথচ এবিষয়ে বিভিন্ন নেতৃত্বের মানসিকতা তৈরির জন্য কম ছোটছুটি তিনি করেননি। কারণ একটি জাতির ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কিছু হয় না। জাতির প্রতিচ্ছবি হয় তার পতাকায়। তাকে নিয়ে ১৯০৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত নানা দল, নানা ব্যক্তির চলছিল ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দানের মধ্যে দিয়ে তার প্রকাশ। জাতীয় পতাকার মধ্যে যে সেই দেশের গৌরব, ইতিহাস, পরম্পরা, সংস্কৃতি, মর্যাদা প্রভৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠা উচিত, সেরকম সার্বিক চিন্তন সকলে করত না। বেশিরভাগ ধারণাই ছিল রাজনীতিকে ঘিরে। ইতিমধ্যে সকলের সঙ্গে আলোচনা করে, হিন্দু ও মুসলমানের সমর্থনে তিন রং দিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি হয়েছে। ফলে অন্য সম্প্রদায়গুলিও তাদের রং পতাকার মধ্যে ব্যবহারের ইচ্ছা প্রকাশ করল। শেষপর্যন্ত তার সমাধানের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের সমিতি গঠিত হলো।

এই সমিতির মধ্যে ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়া, ডঃ না সু হার্ডিকর, আচার্য কাকা কালেলকর, মাস্টার তারা সিংহ এবং মৌলানা আবুল



## গল্পকথায় ডাক্তারজী

কালাম আজাদ। এই সাতজন সদস্য সামগ্রিক আলোচনা করে ভারতের জাতীয় পতাকার রূপরেখা তৈরি করবেন। একসময় তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা লিখিতভাবে জানালেন— ‘আমাদের সর্বসম্মত অভিমত এই যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ধ্বজ এক রঙেরই হওয়া উচিত। ভারতের সমস্ত মানুষকে একসঙ্গে উল্লেখ করতে চাইলে গৈরিক রং-ই সকলের সর্বাধিক স্বীকৃতি হতে পারে। অন্য সব রঙের থেকে গৈরিক রং অধিক স্বতন্ত্র স্বরূপ ব্যক্ত করে এবং তা ভারতের অতীত পরম্পরার অনুকূল।’

কংগ্রেস কার্য সমিতির অনুমোদন ছাড়া এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হবে না, তা ডাক্তারজী ভালোভাবে জানতেন। আর এটাও জানতেন,

এবিষয়ে গান্ধীজী যদি তিনরঙা পতাকা করার মনস্থ করেন, তবে এরা কেউ মুখে কিছু বলতে পারবেন না। তাই ডাক্তারজী খুব তাড়াতাড়ি কংগ্রেস কার্যকারী সমিতির অন্যতম সদস্য লোকনায়ক বাপুজী অনের কাছে ছুটলেন। লোকনায়ক অনে ছিলেন গৈরিক রঙের পক্ষপাতী। ডাক্তারজী তাঁকে অনেক করে বোঝালেন কমলা রং আর গৈরিক রঙের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই — এই সিদ্ধান্তটি খুবই জরুরি। বাপুজী অনে শেষপর্যন্ত ডাক্তারজীর কথায় সম্মত হলেন।

পরবর্তী পদক্ষেপে ডাক্তারজী দিল্লি গিয়ে লোকনায়ক অনের বাসস্থানে থেকে অন্য অনেক নেতার সঙ্গেও কথা বলেন। কিন্তু ফল যা হবার তাই-ই হলো। কংগ্রেসের অখিল ভারতীয় বোম্বাই অধিবেশনে ‘পতাকা সমিতি’র প্রতিবেদন উপস্থাপন হলে তা গ্রহণ না করে তিনরঙা পতাকাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হলো। শুধু লালের পরিবর্তে গৈরিক রং গ্রহণ করা হয় এবং তা পতাকায় সবার উপরে থাকবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয় পতাকার ব্যাখ্যা ধর্মের ভিত্তিতে হবে না, বিভিন্ন গুণের প্রতীক বলে তা স্বীকৃত হবে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জাতীয় পতাকার বিষয়টা পূর্ববৎই থাকলো। আধ্যাত্মিকতা ত্যাগ, ঐতিহ্য, পরম্পরা ও ভারতের সংস্কৃতির প্রতীক গৈরিকধ্বজ জাতীয় পতাকা রূপে স্বীকৃতি না পাওয়ায় ডাক্তারজীর মতো রাষ্ট্রভক্ত ব্যক্তিত্বের পক্ষে একটু হতাশ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস